আনন্দমেলা
১.৫০
পাঁচ ঘণ্টা

আশ মিটিয়ে আকাশ-ছোঁয়া
মহল বানাবো···
সবদিকেতেই রঙবেরঙের
জেম্‌স লাগাবো !

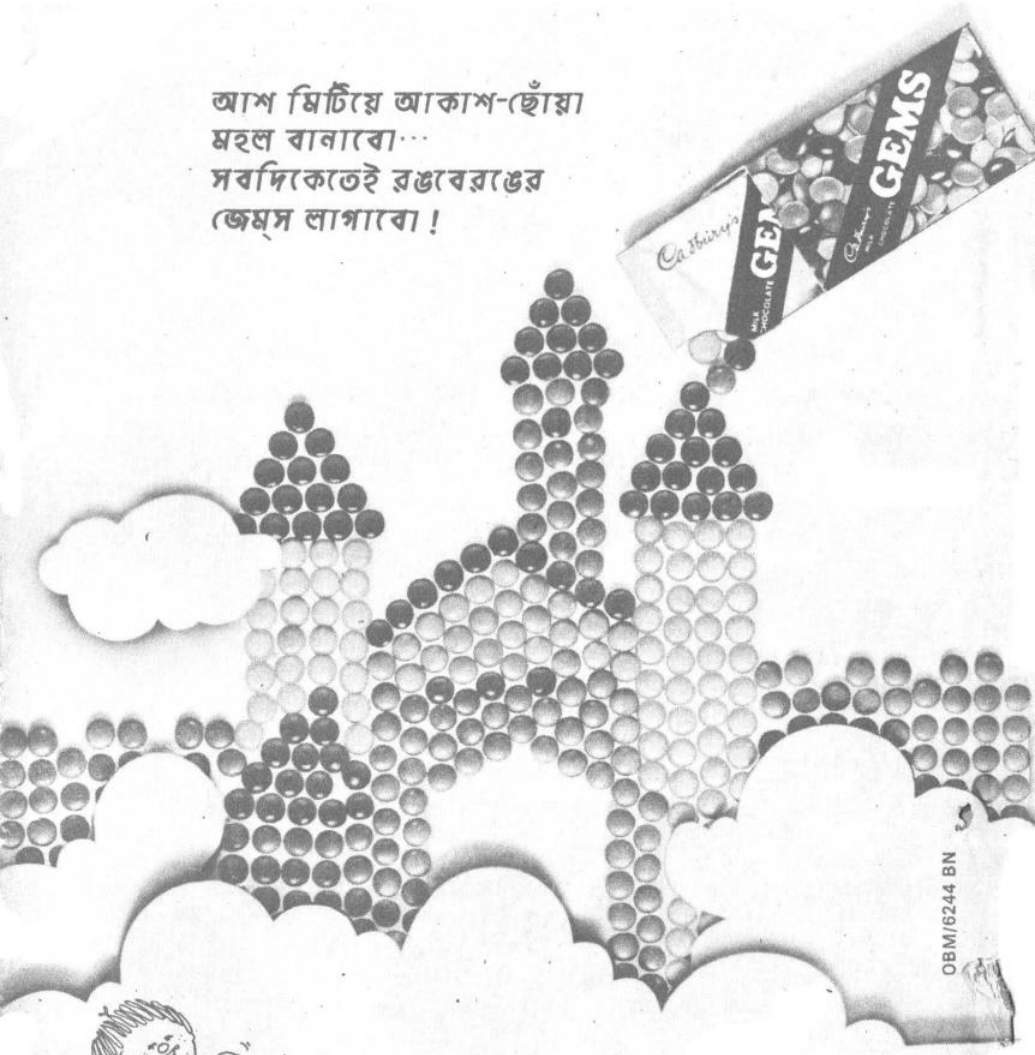

স্বপ্ন সুন্দর কত... জেম্‌স আনো পারো যত!

ক্যাডবেরিস্
চকলেটস্

ক্যাডবেরি জেম্‌স এমন, মিষ্টিমধুর স্বপ্ন যেমন!

আনন্দমেলা

২৩ বৈশাখ ১৩৮৮ • ৬ মে ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ২ সংখ্যা

বিশেষ রচনা

যা দেখেছি যা পেয়েছি। পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫৩
পাতালে পাঁচ ঘন্টা। সুদেষ্ণ রায়চৌধুরী ৪

গল্প

দাদুর দাঁদালো দাঁত। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১০
টুনেগাসি। শ্রীধর সেনাপতি ১৭
ডো-ডো মামা। সত্যেন্দ্র আচার্য ৫৬

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ২২

উপন্যাস

হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৯
সিসের আঙটি। বিমল কর ৪৯

কবিতা ও ছড়া

ষড়ানন গড়াই। প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮
তিমির ভাবনা। নৃপেন্দ্র সান্যাল ২৫
জুঁইফুল। সুনীল বসু ৩৯

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল। পি· কে· ২৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স

রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪

লেখাপড়া

বাংলা বলো। বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো

চীনা অ্যাক্রোব্যাট। অহিভূষণ মালিক ৪২
রাবার গেল। অশোক রায় ৪৬
তিন 'বড়'র কে দড়। রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪৪

অন্যান্য আকর্ষণ

ছবির মজা ২৭, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৩৭, আঁকো-শেখো ৬৬

প্রচ্ছদ (চীনা অ্যাক্রোব্যাট) : তপন দাশ

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং দেশ পাবলিকেশন্স (প্রা) লিমিটেড, ২৬৭ রয়াপেট্টা হাই রোড, মাদরাজ ৬০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

আনন্দমেলা

আগামী সংখ্যায়

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
তথ্যে-ঠাসা অসামান্য রচনা

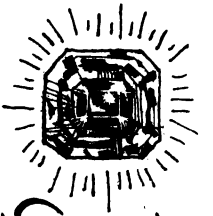

খনি থেকে খনিজ

অশেষ চট্টোপাধ্যায়ের
বেদম হাসির গল্প

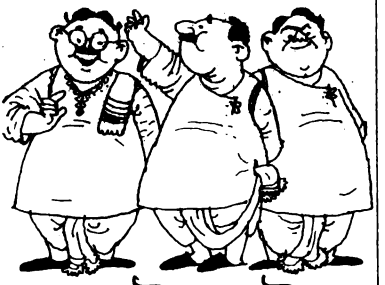

খাই-খাই

উপন্যাস, স্মৃতিকথা, প্রভৃতি
নিয়মিত বিভাগ এবং
আরও অজস্র [illegible]
আকর্ষণ

পাতালে পাঁচ ঘণ্টা

সুদেব রায়চৌধুরী

এখন আমরা ছাব্বিশশো ফুট নীচে পাতালের অন্ধকারে। মাথার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে দামোদর। ভাবছ, কোথায় এলাম? লিফ্‌টে চেপে হুহু বেগে পাতালের গভীরে নামবার সময় আমরাও ভেবেছিলাম। পাছে কেউ ভিতু মনে করে তাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনি। শ্রাবণের ধারার মতো লিফ্‌টের চারধারে বৃষ্টির শব্দ। আমাদের গায়েও পড়ছে দু-চার ফোঁটা। সহকর্মী ফোটো-গ্রাফার বিশুদা লিফ্‌টের মধ্যে চুপচাপ ছিলেন। লিফ্‌ট বা কেজ থেকে নীচে পা দিতেই বললেন, "সুদেব, কোথায় এলাম বল দেখিনি। চোখটা বোধহয় গেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।" পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন অনুপবাবু, ইস্টার্ন কোলফিল্ডস-এর অনুপ গুপ্ত। অনুপবাবু বললেন, 'বিশ্বরঞ্জনবাবু, আপনারা বন্ড সই করে নেমেছেন। পরিষ্কার

উৎপাদনের নিশানা ওই নিশান

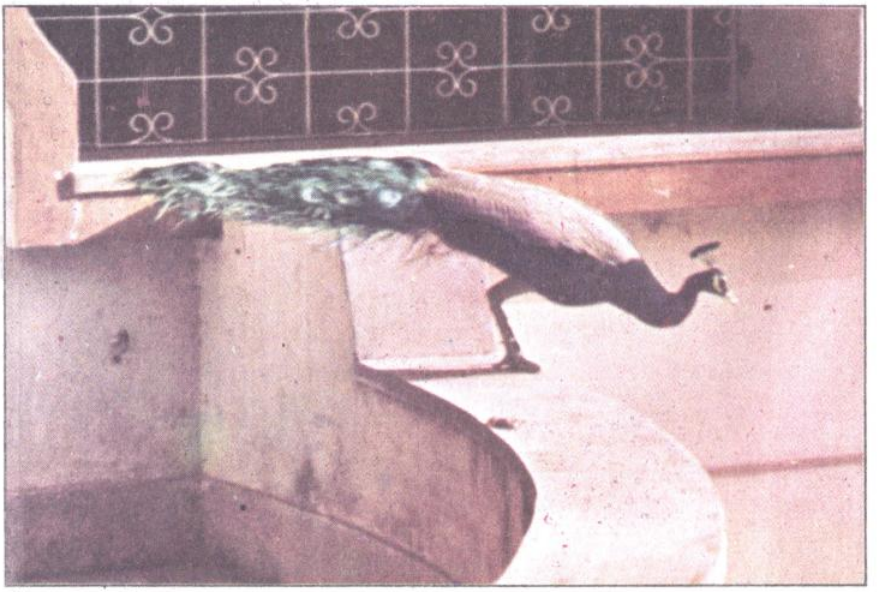

খনির পোষা ময়ূর, কিন্তু আগের মতো খাবার পায় না

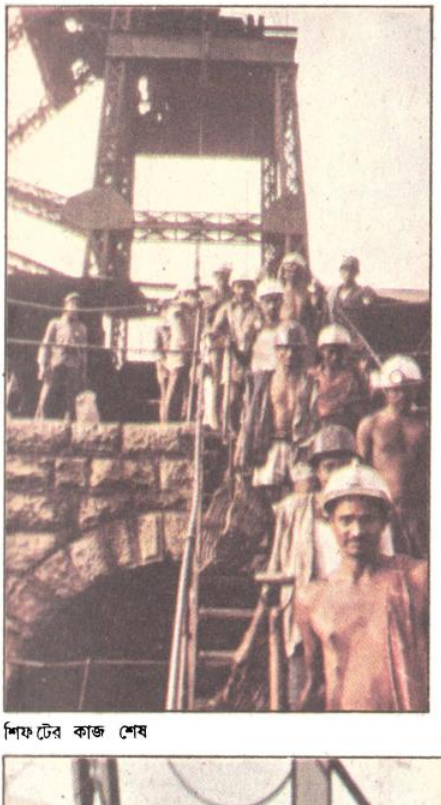

শিফটের কাজ শেষ

লিখে এসেছেন, 'আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।' তাহলে ভয় পাচ্ছেন কেন?" অন্ধকারে বিশুদার মুখখানি ঢাকা পড়ে গেল। অভয়বাণী শোনালেন বয়সে তরুণ সহকারী কোলিয়ারি ম্যানেজার অসীম চ্যাটার্জি। বললেন, "বিশ্বরঞ্জনবাবু, চশমাটা রুমাল দিয়ে মুছে নিন। আমরা ভূপৃষ্ঠ থেকে ছাব্বিশশো ফুট নীচে এসে গিয়েছি। ভেপার জমে কাঁচটা অস্পষ্ট হয়েছে। তাই ঝাপসা লাগছে। ভয় পাবার কিছু নেই।"

চিনাকুড়ি কয়লাখনির খাদ ভারতে তো বটেই এশিয়ার গভীরতম খাদ। সেখানেই কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে এলাম। সময় বেলা এগারোটা। তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১। আলিবাবার চিচিং ফাঁকের মতো বড় লোহার দরজা "খোলা-বন্ধের" ব্যাপার-স্যাপারও আছে এর মধ্যে। আছে বড় বড় সুড়ঙ্গপথ—খনির মানুষের কাছে যা 'গ্যালারি' বলে পরিচিত। এসব সুড়ঙ্গ অমাবস্যার অন্ধকারকেও হার মানিয়ে দেবে। গাদা-গাদা অন্ধকার চারদিকে ছড়ানো। একবার লুকোতে পারলে কার সাধ্যি খুঁজে বার করে। খাদে নামার আগে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অসীমবাবু খাকি হাফপ্যান্ট পরে সামনে দাঁড়ালেন। গায়ে

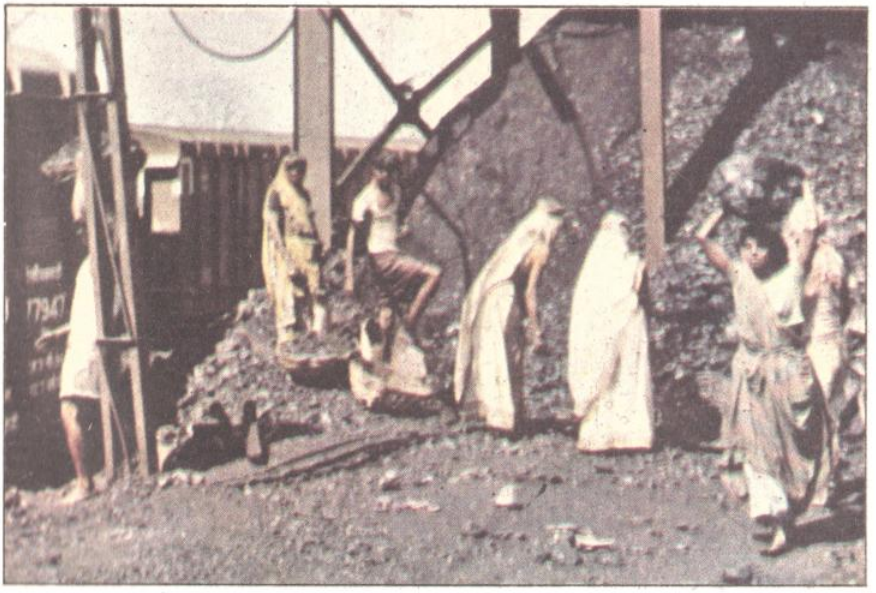

ওগাগনে কয়লা বোঝাই হচ্ছে

হাফহাতা শার্ট। হাতে একখানি ছড়িলাঠ। মাথার নীচে ঠিক কপালে লাগানো একটি বাতি। টর্চের বাল্ব বসানো। আমাদেরও যেতে হল সেই বাতিঘরে। সেখানে একটি শেলফে হেলমেটের মতো বাতিগুলি পর-পর সাজানো। বাতি ছাড়া কেউই খাদে বা খনির গভীরে ঢুকতে পারবেন না। প্রতিটি বাতির একটি করে নম্বর আছে। সেই নম্বরটি বাতি-ঘরে ঝুলতে থাকে। মোটরের মতো ওই নম্বরটি হল খনির শ্রমিক-কর্মচারীর পরিচয়। বাতিঘর হল লালবাজারের কন্ট্রোলরুমের মতো। কতজন শ্রমিক খাদে কাজ করছেন তাও বলে দেওয়া যাবে এই বাতিঘরে বসে। কয়লাখনির খুব রসিক। বেশ হাসাতে পারেন। কেজ-এর দিকে যেতে যেতে বললেন, "দেখুন, আপনারা ভয় পাচ্ছেন কেন? সীতার পাতালপ্রবেশের কাহিনী পড়েননি? মনে মনে ভাবুন, আমরা সবাই চিনাকুড়ির সীতা সেজে পাতালে রওনা হয়েছি।" আমার কিন্তু হাসির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও করছিল। কিসের ভয়? সেকথা পরে বলছি। তার আগে চলো, একবার কয়লারাজ্যে ঘুরে আসা যাক।

জল, বায়ু, মাটির পরই আধুনিক সভ্যতায় কয়লার স্থান। কৃষ্ণকায় এই মূর্তি-কাসার বস্তুটি দৈত্যের মতো একটি মূর্তিমন্ত ডায়নামো। বিশাল শক্তির উৎস। কয়লা বা

ইনক্লাইনড খনির মুখে

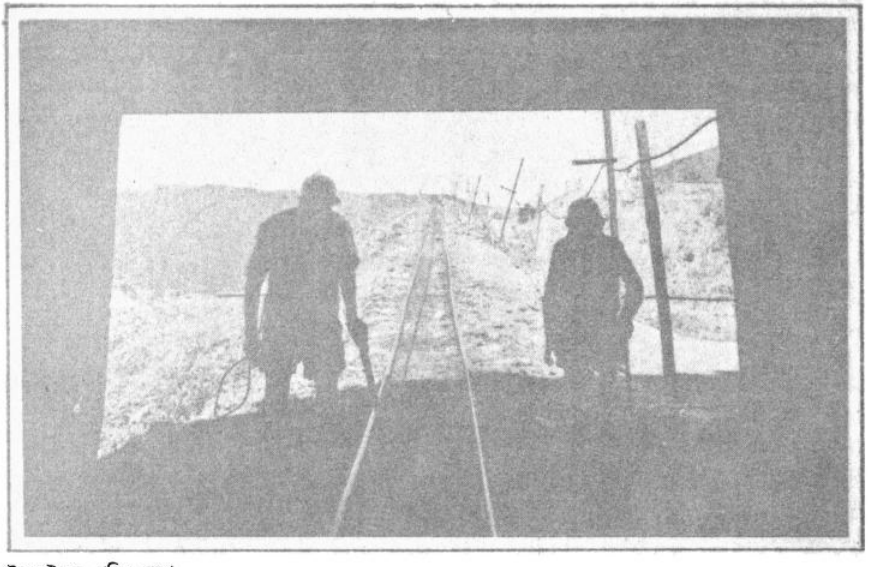

প্রতিটি শিফটে বাতির সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। নির্দিষ্ট সংখ্যার সঙ্গে মেলালেই বোঝা যাবে কতজন শ্রমিক খাদে নেমেছে। ব্যাটারি-বাতি ভিন্ন খনির ভিতরে কাজ করা অসম্ভব। আর আছে হাতে ঝোলানো ডেভি সেফটি ল্যাম্প। ইলেকট্রনিক। ধূমপান বারণ। খনিতে ঢোকার আগে দেহতল্লাসি অবশ্যক। এই পাতালের দেশে চন্দ্র-সূর্য চিরঅস্তমিত। বাতি কপালে বেঁধে নিলাম। বেল্ট লাগানো। বাঁধতে কোনও কষ্ট নেই। এরপর মাথায় হেলমেট পরলাম। ডেপুটি পারসোনেল ম্যানেজার ধীরেন্দ্রনাথ কর এগিয়ে এলেন। মাঝবয়সী এই ভদ্রলোকটি মৃদঙ্গার বর্তমান জগতে খনিজরূপে আত্ম-প্রকাশ করলেও এর জন্ম কোটি কোটি বছর আগে। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সৌরশক্তিরই কিছু অংশ এই কয়লা। অসংখ্য গাছপালা, নানাবিধ বনজ সম্পদ মাটিতে পড়ে পড়ে জমা হয়েছে। সঙ্গে মিশেছে জল আর বালুকণা। মৃত বৃক্ষরাজি লতাপাতা সব-কিছু মাটিতে মিশে যায়। আবার সেই মাটিতেই গাছপালা গজিয়ে ওঠে। সেগুলিও একদা মরে গিয়ে মাটির নীচে চলে যায়। এই পদ্ধতিতে মাটি ও বালু মিলেমিশে রকের সৃষ্টি হয়।

স্তর অনুযায়ী কয়লার স্তরভেদ আছে। কাণ্ডল মরে গিয়ে কালো রূপ নেয়। কালো বস্তুটিই কয়লার স্তরে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। কয়লার এই স্তরকেই বিজ্ঞানীদের ভাষায় সীম বলেও চিহ্নিত করা হয়। কোনও-কোনও ব্লক বা শিলায় পাতার ছাপ স্পষ্ট। ভারতে বর্ধমান জেলার এথোরায় ১৭৭৪ সালে বোধহয় প্রথম কয়লা তোলা হয়।

কয়লার ভিতর যে আগুন লুকিয়ে আছে একথা প্রথম কে আবিষ্কার করেছিলেন, বলা কঠিন। নদীর পারেই প্রথম কয়লার সাক্ষাৎ মেলে। পাহাড়েও মিলেছে কয়লা। দামোদরের পারে কয়লা ছিল বলেই সেকালে নৌকোয় কয়লা চলাচল হত। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়লা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রানীগঞ্জ নারায়ণকুঠি কয়লাখনি অঞ্চলে ঘুরলে এসব তথ্য চোখে পড়ে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুযায়ী তিন-চার হাজার বছর আগে ব্রিটেনের ওয়েলস-এ গ্লামোরগানশায়ারে শবদাহের জন্য প্রথম কয়লার ব্যবহার হয়। প্রাচীনকালে রোম ও গ্রীসেও কয়লার প্রচলন ছিল। মার্কো পোলোর অভিযান-সংক্রান্ত পুস্তিকা থেকে জানা যায়, শিউ আন নামে এক ব্যক্তি চীনা সাহিত্যে কয়লার উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায় কয়লার নাম, আইস-চারকোল। খনির আবার শ্রেণীভেদ আছে। সাধারণত তিন ধরনের খনি আছে। পুকুরের মতো কেটে কয়লা বের করা, যাকে বলা হয় ওপ্ন কাসট মাইন। দ্বিতীয়টি ইনক্লাইন্ড বা সুড়ঙ্গখনি নামে পরিচিত। অর্থাৎ মাটির উপর থেকে সুড়ঙ্গ কেটে ভিতরে ঢুকে যাওয়া। আর তৃতীয় শ্রেণীর কয়লাখনি হল পিট বা খাদ। কুয়োর মতো গর্ত করে ভিতরে ঢুকে খাদে নামতে হয়। এবং সেই খাদের মধ্যে থেকে কয়লা কেটে বের করে উপরে তুলতে হয়। খাদে কয়লা কাটা এবং পরে উপরে তোলা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। খাদের গভীরতারও তারতম্য আছে। বিপদের ঝুঁকিও অনেক বেশি। তার কারণ, এই সব গভীর খাদে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নানাবিধ ব্যবস্থা করার কথা; সেই বিধিব্যবস্থায় বড় রকমের ত্রুটি থাকলে যে-কোনও সময়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। ১৯৫৮ সালে এই চিনাকুড়ি কয়লাখনির ভয়াবহ দুর্ঘটনার কথা বেশ মনে আছে। খাদে বা খনিগর্ভে এক বিস্ফোরণের দরুন প্লাবিত হয় খনিটি। কম করে চারশো খনি-শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে।

এসব কথা ভেবে ভয় কি চেপে রাখা যায়? লিফ্‌টে চেপে খাদের গভীরে নামবার সময় কানের ভিতর বোঁ-বোঁ আওয়াজ হতে লাগল। সহকারী কোলিয়ারি ম্যানেজার অসীমবাবু খাদে দাঁড়িয়ে বললেন. "এখানে

চিনাকুড়ি খাদের প্রবেশ-পথ

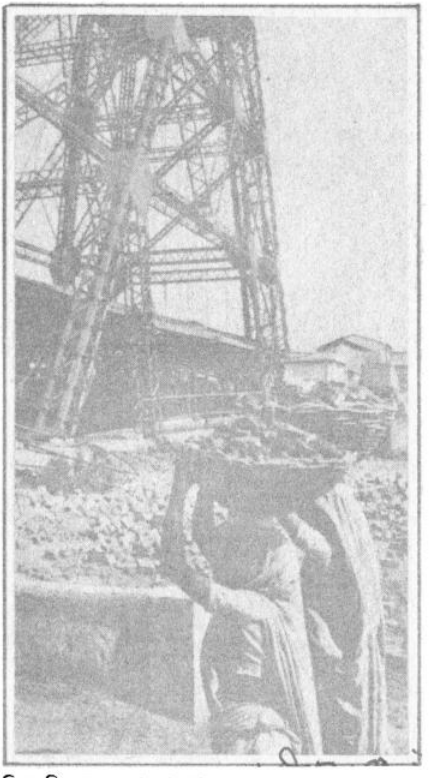

আপনি আলো দেখতে পাচ্ছেন! এ-আলো সর্বত্র নেই। যেখানে কয়লা আছে সেখানে কিন্তু অন্ধকার। আর তাছাড়া বেশ গরম।'' এই বলে অসীমবাবু লোহার সিন্দুকের মতো একটা দরজার পাল্লা টেনে আমাদের ঢুকিয়ে দিলেন। নিজেও ঢুকলেন। ঢুকেই বুঝলাম দরজার একপাশে শীতকাল, আর অন্যপাশে গ্রীষ্মকাল। দুহাত ফারাকে তাপের এই তারতম্য কেন? নিশ্চয়ই তোমাদের

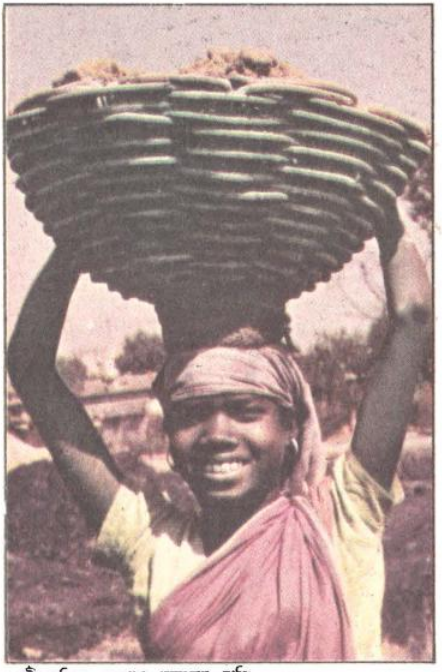

নারী-শ্রমিক, মাথায় কয়লার ঝুড়ি

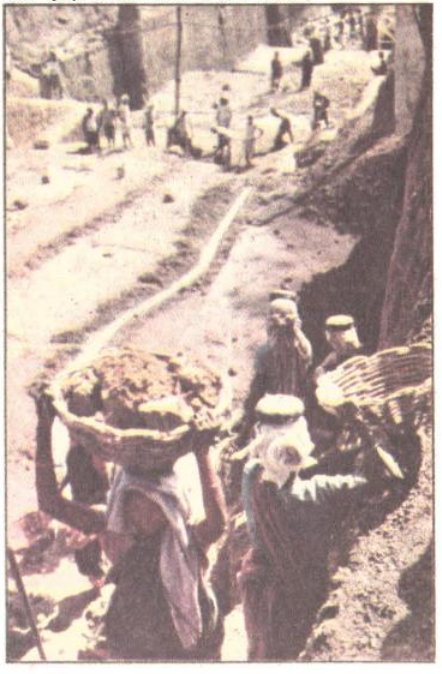

মাটি কেটে কয়লা রাখার জায়গা হচ্ছে

জানতে ইচ্ছে করছে। খাদের ভিতরকার বিষাক্ত বায়ু একজস্ট ফ্যানের সাহায্যে বের করে দেওয়া হয়। ওই বায়ু বেরোবার পথে গরম হাওয়ার সৃষ্টি করে। তবে কাজ ছাড়া খনিশ্রমিকরা লোহার সিন্দুকের পাল্লা খুলে কখনোই গরমের রাজ্যে পা দেন না। খাদে নামলেই কয়লা মিলবে না। এজন্য খাদের নির্দিষ্ট জায়গায় ডিটোনেটারের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে। গ্যাসমুক্ত খনিতে খুব সতর্কতার সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটাতে হয়। ইলেকট্রিক তারের নেগেটিভ-পজিটিভের সংযোজনে এই বিস্ফোরণ ঘটে। মাইনিং সর্দারের কাছে থাকে বিস্ফোরক দ্রব্য। আর ইলেকট্রিক তার থাকে অন্য কোনও অভিজ্ঞ খনি-শ্রমিকের কাছে। বিস্ফোরণের কিছু পর খুদে রেলওয়াগন বা টাবে করে কয়লা খনিমুখে আনা হয়ে থাকে। মারটিন রেলের মতো ছোট রেললাইনও আছে এই খাদের মধ্যে। এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে কয়লা বয়ে নিয়ে যায় টাবগুলি। সমকোণের দূরত্বে দাঁড়িয়ে এই বিস্ফোরণ ঘটালে বিপদের ঝুঁকি নেই। তবে এ ধরনের গভীর খাদে মিনিট পনরোও যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে তাহলে আর রক্ষে নেই। মুহূর্তের মধ্যে খাদ জলমগ্ন হবে। তাই বলে কি চিনাকুড়িতে লোডশেডিং নেই? লোডশেডিং লেগেই আছে। অবশ্য নিজস্ব জেনারেটর আছে। একটি নয় দুটি। একটি খারাপ হলে অন্যটি চলবে। প্রতি মিনিটে এক হাজার গ্যালন জল তুলে উপরে ফেলতে হয়। তাহলে চব্বিশ ঘন্টায় কী পরিমাণ জল তুলতে হয়, একবার খাতা-কলম নিয়ে হিসেব করে দ্যাখো তো। প্রতি সাত দিনের জলে পাহাড়ি এলাকার ছোটখাটো একটা নদীর রূপ নিলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল ওয়াইনডিং ইনজিন। এর চালক বা ওয়াইনড্যারের উপর খাদের নীচে লিফট বা কেজ ওঠানো-নামানোর দায়িত্ব ন্যস্ত। এখানেও এক মিনিটের জন্য বিদ্যুৎ বন্ধ হলে চলবে না।

আসানসোলের পর থেকেই কয়লাখনি রাজ্য। অনুপবাবু বলেছিলেন ঃ বরাকর, দিশেরগড়, কুনোস্তোরিয়া, রতিবাটি, সোদপুর, জেমেহেরি যেখানেই যান না কেন মাথার উপরে দেখতে পাবেন উঁচু টাওয়ারের মতো

লোহার একটা খাঁচা। এটিই হল কয়লাখনির মাথা। হেডগীয়ার। খনি-শ্রমিকের কাছে এই হেডগীয়ারটি দেবতার মতো। আমার (অনুপের) বাবা এই চিনাকুড়িরই অবসরপ্রাপ্ত চীফ মাইনিং ইনজিনীয়ার। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হলেও বাড়ির জানলায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একবার দেখে নেন চিনাকুড়ির হেডগীয়ারের চূড়াটিকে। সাহেব কোম্পানির আমল আর নেই। ১৯৭৩ সনের জানুয়ারি মাস থেকে ভারতের সব কয়লাখনিই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। কোল ইনডিয়ার অধীন চারটি সরকারি পরিচালনাধীন কোম্পানি : ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড, ভারত কোকিং কোল লিমিটেড, সেন্ট্রাল কোকিং কোল এবং ওয়েস্টার্ন কোকিং কোল লিমিটেড-এর মধ্যে ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড সংস্থার অধীনে আছে ১১৮টি কয়লাখনি। বেশির ভাগই পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জ দিশেরগড় সালানপুর অঞ্চলে। ইস্টার্ন কোলফিল্ডসের কর্ণধার হলেন ম্যানেজিং ডিরেকটর ও চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখর ঝা। বরাকর স্টেশন থেকে মাইল তিনেক গেলেই সাঁকতোরিয়া। এই সাঁকতোরিয়া হল ইস্টার্ন কোলফিল্ডসের ডালহাউসি বা বি-বা-দী বাগ। প্রধান কার্যালয়। সব সময়ই কর্মচঞ্চল। এখানেই কাঁচে ঘেরা ঘরে বসে চন্দ্রশেখরবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। স্যুট-পরা এই ভদ্রলোককে দেখলে কেউ আঁচও করতে পারবেন না যে, দীর্ঘকাল তিনি কয়লাখনির খাদে নেমে খনিশ্রমিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। মাইনিং ইনজিনীয়ার থেকে ধাপে ধাপে তিনি আজ সাফল্যের শীর্ষে। চন্দ্রশেখরবাবু বললেন : ইস্টার্ন কোলফিল্ডসে ১১৮টি কয়লাখনিতে এক লাখ ৮৬ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। মাসে বেতনের জন্য ব্যয় হয় তেরো কোটি টাকা। পাঁচশোর নীচে কোনো স্থায়ী শ্রমিকের বেতন নেই। তাছাড়া রাশিয়া ও পোল্যান্ডের সহযোগিতায় খনির কাজের যথেষ্ট উন্নতি করার চেষ্টা চলছে। এতেও ব্যয় হবে কোটি কোটি টাকা। নানান কারণে প্রতিদিন প্রায় এক কোটি টাকার মতো লোকসান হচ্ছে। তবে কয়লার উৎপাদন বেড়েই চলেছে।

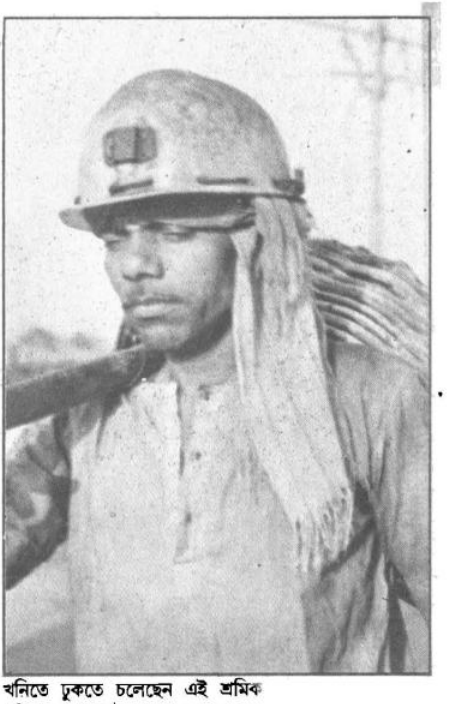

খনিতে ঢুকতে চলেছেন এই শ্রমিক

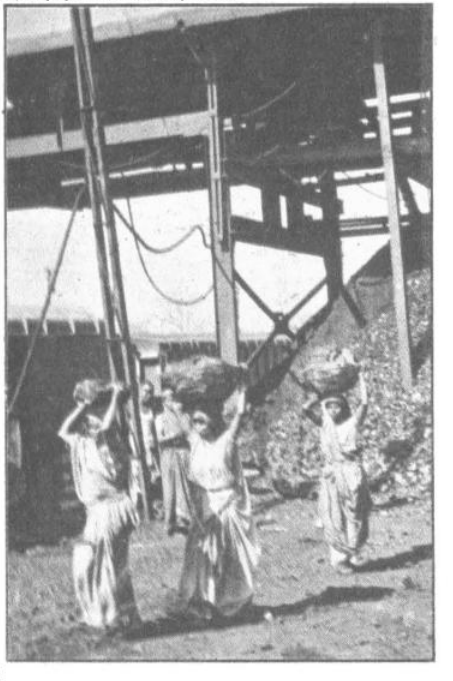

খনি থেকে উঠে আসছে কয়লা

ফোটো বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

দাদুর দাঁদানো বাঁত

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

দাদু যখন সকালে বেড়াতে বেরোবেন তখন হাতে থাকবে পাকানোপাকানো বেতের লাঠি। সে লাঠির কী বাহার। বাবা এনে দিয়েছিলেন মুসৌরি থেকে। আর যখন কোনো কাজে বেরোবেন তখন আর লাঠি নয়, তখন আমি তাঁর পাশে এক চলন্ত লাঠি। দাদুর ভারী ডানহাত আমার কাঁধে। আমার উচ্চতাও ওই লাঠিটার মতোই। দাদুর হাতে আমার কাঁধটা বেশ ফিট করে যায়। চলন্ত লাঠির গতি যখন বেড়ে যেতে চায় দাদুর হাত তখন কাঁধ খামচে ধরে পাশাপাশি টেনে আনে। আমার চেহারাটাও ঠিক লাঠির মতো। মা বলেন, খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দম। হবে না! অত খেলে কারুর চেহারা ভাল হয়! অষ্টপ্রহর মুখ চলছে। দুঃখ হয় কথা শুনে। কিছু বলতে পারি না। দেওকীনন্দন বলেছে, ঘাবড়াও মাত। চানা চালাও, বঠকি লাগাও, পবননন্দন বন যাও। ঘাড় হো যায়গা লোটা কা মাফিক। হাত হো যায়গা ডাম্বেল কা মাফিক। সম্‌ঝা ছোটা বাবু?

এখন আমরা চলেছি দাঁতের ডাক্তারের কাছে। আমাদের শহরে যেখানে বাজার সেখানে একটা জুতোর দোকানের পাশে ছোটমতো ডাক্তারখানা। ভাঁজ করা দরজার একদিকে একটা কাঁচের কেসে দুপাটি দাঁত সব সময় আমার স্কুলের পণ্ডিতমশাই-য়ের মতো শীত নেই গ্রীষ্ম নেই খিঁচিয়েই আছে। আর-একপাশের দরজায় মাফলার জড়ানো গাল-ফুলো এক মুখের ছবি। যন্ত্রণাকাতর। তলায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, দন্তশূল, তিন শূলের এক শূল। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না দিলে মরতে হয়। সামনের দিকে গালফুলোদের বসার জন্যে দুপাশে দুটো বেন্‌চ। ভেতর দিকে পদার আড়ালে একটা উঁচু চেয়ার। সেইখানেই ঠেসে ধরে সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত তোলা হয়। কোণের দিকে জলের কল, বেসিন। আমি দাদুর সঙ্গে চৌষট্টিবার এই দোকানে এসেছি। কোথায় কী আছে সব মুখস্থ।

দাদুর ওপরের পাটিতে ষোলো, নীচের পাটিতে ষোলোটা দাঁত ছিল। সবই এই ডাক্তারবাবু একটা-একটা করে টেনে-টেনে তুলেছেন। বত্রিশ মাস সময় লেগেছে। দাদুর সে কী গর্ব। সকলের নাকি বত্রিশটা দাঁত থাকে না। ঠিক ঠিক ওপরে ষোলোটা আর নীচে ষোলোটা, দুই মিলিয়ে ঠিক

বত্রিশ দাঁত, লম্বা খাড়া নাক, টানা-টানা চোখ, মহাপুরুষের লক্ষণ। দাদুর সব-কটা লক্ষণই স্পষ্ট। তবে একটাই যা দুঃখ, দাদুর সব-কটা দাঁতই এই সিধুডাক্তারের সাঁড়াশি শেষ করে দিয়েছে। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দাদু বোঝেননি। মা আমাকে বকেন। দাদুকে তো বকতে পারেন না। দাদু যে মায়ের বাবা। অত মিষ্টি খেলে কারুর দাঁত ভাল থাকে। দাদু আবার বাবাকে উপদেশ দেন, মিষ্টি খেয়েই বেশ ভাল করে কুলকুচো করে মুখ ধুয়ে ফেলবে, দেখবে দাঁত ঠিক থাকবে, একেবারে ছবির মতো। আশি বছরেও বসে বসে ছোলাভাজা চিবোচ্ছ। কচি কলাপাতা থেকে চেটে চেটে তেঁতুলের আচার খাচ্ছ টকাস টকাস শব্দ করে। দাদু যখন এই সব বলেন, আমি মনে মনে হাসি। যিনি বলছেন তিনি নিজেই এখন ফোকলা।

সন্ধে-সন্ধে হয়ে এসেছে। সিধুডাক্তার লিক-লিকে একটা ধূপ জ্বেলে দেয়ালে টাঙানো তাঁর গুরুদেবের ছবির সামনে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার চুল ছুঁয়ে পিনপিন করে ধূপের ধোঁয়া উঠছে। গুরুদেবকে মোটেই ভাল দেখতে নয়। দাঁতের ডাক্তারের গুরুদেব বলেই বোধহয় সামনের দাঁত দুটো অত বড় বড়। ছবির দিকে তাকালেই আগে চোখ পড়ে যায় দাঁতে, তারপর গলার রুদ্রাক্ষের মালায়, তারপরই ভুঁড়িতে। কাউকে বলিনি, ছবিটা দেখলেই আমার মনে হয়, একেই বলে টাস্ক ফোর্স। টাস্ক হল হাতির দাঁত, সেইটাই ফোর্সে বেরিয়ে এসেছে সামনে। নিশ্চয়ই দেহ রেখেছেন। মহাপুরুষদের মৃত্যুকে বলে মহাপ্রয়াণ। আহা, দাঁত দুটো ডাক্তারবাবু যদি খুলে নিয়ে ওই শো-কেসে রাখতেন, যেখানে দুপাটি দাঁত মুখ ছাড়াই পড়ে পড়ে হি হি করে ভূতের হাসি হাসছে। গুরুদেবের ছবির মাথার ওপর কাঠের ব্র্যাকেটে একটি মাটির গণেশ। ভারী ভাল মানিয়েছে। না বাবা, এসব ভাবব না। ওঁরা যেখানেই থাকুন যদি মনের কথা জেনে ফেলেন নির্ঘাত অঙ্কে ফেল করিয়ে দেবেন।

আমি হুড়মুড় করে দোকানে উঠতে যাচ্ছিলাম। দাদু টেনে ধরলেন, "দেখছ না পুজো হচ্ছে! হুড়মাড় করে ঢুকলেই হল। একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।"

দাদুর পাশেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পরেই সিধুডাক্তার ওই রকম কপালে ধূপসমেত হাত ঠেকানো অবস্থাতেই আমাদের দিকে ফিরলেন। চোখ আধবোজা। ঠোঁট নড়ছে বিড়বিড় করে। সেই ঠোঁটে আমাদের দেখে একটু হাসির রেখা উঠেই মিলিয়ে গেল। আমরা যে দিকে দাঁড়িয়ে আছি সেটা পশ্চিম। সূর্য ওই দিকে ডুবে গেছে অনেক আগে। উনি দিককেই নমস্কার

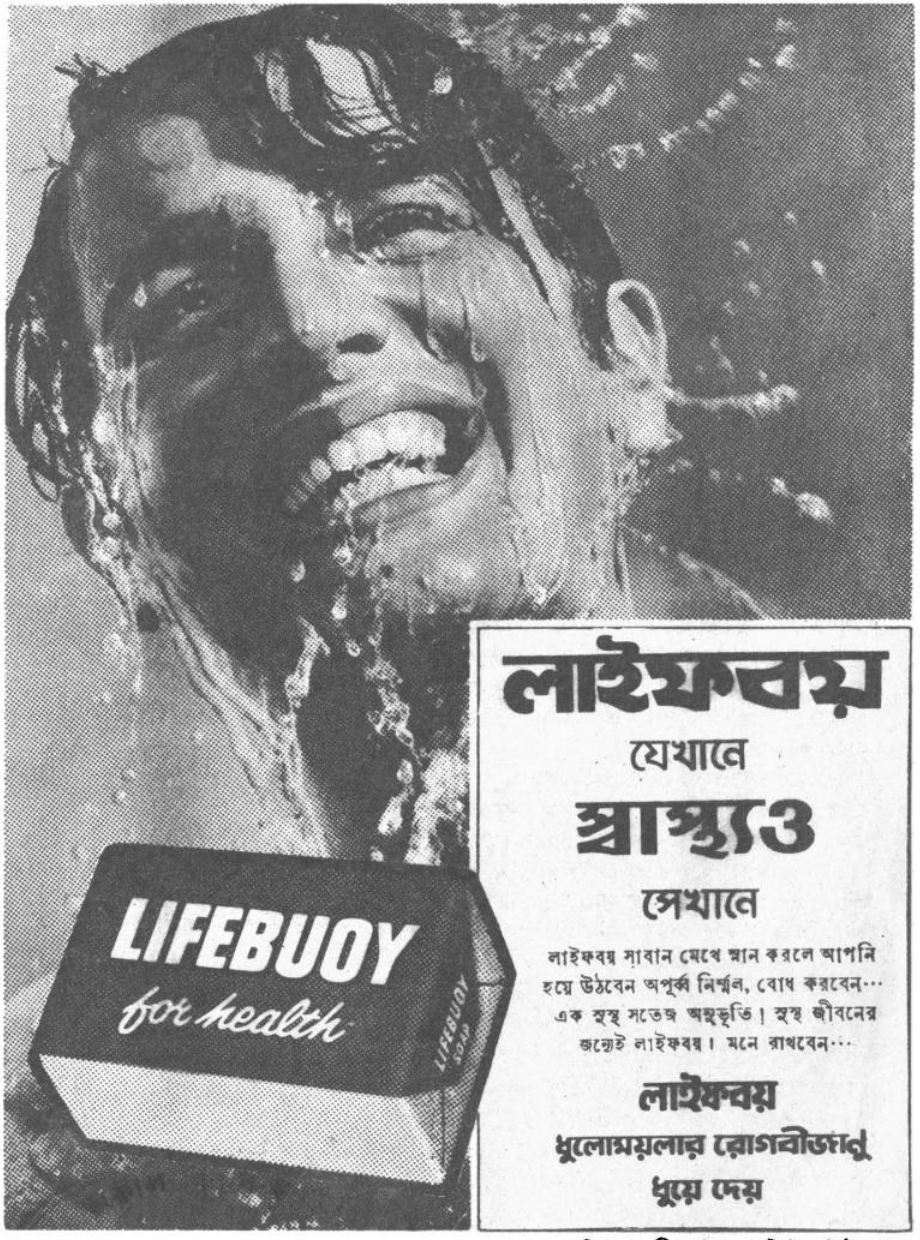

লাইফবয়

যেখানে

স্বাস্থ্যও

সেখানে

লাইফবয় সাবান মেখে স্নান করলে আপনি হয়ে উঠবেন অপূর্ব্ব নির্ম্মল, বোধ করবেন··· এক সুস্থ সতেজ অনুভূতি! সুস্থ জীবনের জন্যেই লাইফবয়। মনে রাখবেন···

লাইফবয়

ধুলোময়লার রোগবীজাণু

ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

জানাচ্ছেন। ঘুরে গেলেন দাক্ষণে। দক্ষিণ থেকে পুবে। পুবেই সেই দাঁততোলার বিদঘুটে চেয়ার। ওই দিকে একটু বেশিক্ষণ নমস্কার হল। ও দিকে সূর্য ওঠে। তা ছাড়া ওই দিকেই তো দাঁত তোলা হয়। দেয়ালে বড় বড় করে লেখা, ফাইভ রুপিজ এ টুথ, টেন রুপিজ এ ফলস টুথ। নিজের দাঁত ফেলতেও টাকা, নকল দাঁত লাগাতেও টাকা। তবে আসলের চেয়ে নকলের দাম পাঁচ টাকা বেশি।

ডাক্তারবাবু হাসি-হাসি মুখে বললেন, "আরে মুকুজ্যেমশাই, আসুন, আসুন।"

আমরা ভেতরে ঢুকে পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসলুম। দাদু বললেন, "তোমার পিতৃভক্তি দেখে মুগ্ধ হলুম।"

ঘাড় কাত করে ডাক্তারবাবু বললেন, "আজ্ঞে ওই জোরেই তো করে খাচ্ছি। ঘুষি মেরেও তো দাঁত ফেলা যায়, কিন্তু এমন খুস করে দাঁত ফেলতে কটা লোক পারে। ওই তো বিলেতফেরত জোয়ারদার। টেন রুপিজ এ টুথ। এমন হ্যাঁচকা টান মারে চোয়াল উপড়ে চলে আসে। এক দাঁত তুলতে আর-এক দাঁত তুলে ফেলে।"

"সে যদি বলো, আমার বেলাতেও তোমার হাতে একবার সেই কেস হয়েছে।"

"আজ্ঞে না মুকুজ্যেমশাই, ওটা আমি ইচ্ছে করে করেছিলুম। আমার চয়েস। দুপাটি দাঁতই তো আমার হাতে ছিল। সব-কটাই তোলার কেস, আগে আর পরে।"

"ও যতই বলো তুমি, মানব না, আমি উকিল মানুষ। ও তোমাদের আদত। দাঁত বুঝতে পার না। আমরাও যে কিছু বুঝতে পারব, সে উপায়ও রাখ না। ইনজেকশান দিয়ে অসাড় করে দাও। আর দাঁত তোলার সময় তোমাদের চোখমুখের চেহারাও অসুরের মতো হয়ে যায়।"

"হেঁ হেঁ, কী যে বলেন!"

"হেঁ হেঁ নয়, চিরকাল তাই হয়ে আসছে। চোখেও ওই এক কিস্তি। ডান চোখে ছানি বাঁ চোখ কেটে ব্লাইণ্ড করে দিলে। এরকম কেস আখচার হচ্ছে। যাক ওসব কথা। আমি এসে গেছি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বসুন। আপনার দাঁত রেডি।"

ডাক্তারবাবু ভেতর থেকে নীল ভেলভেটে মোড়া দু'পাটি দাঁত নিয়ে এলেন। টেবিলে খুলে রাখতেই মনে হল মুখ ছাড়াই দাদু হেসে উঠলেন। জিনিসটা দেখতে আসল দাঁতের মতো অমন ধবধবে সাদা নয়, একটু হলদেটে। নকল দাঁতের সঙ্গে নকল মাড়ি লাগানো। ভেলভেট দিয়ে ঘষে ডাক্তারবাবু দাত দু'পাটি দাদুর হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, "ফাসক্লাশ।"

দাদু ফোঁস করে উঠলেন, "তুমি ফাসক্লাশ বললেই তো আর ফাসক্লাশ হবে না, আমাকে পরে দেখতে হবে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়, আপনি পরে নিন। পরে দেখে নিন।"

দাদু এত বড় হাঁ করে দাঁত দু'পাটি একে একে পরে ফেললেন। খটখট করে দুবার আওয়াজ হল। থলথলে মাংস ঝোলা ভালমানুষ-ভালমানুষ মুখটা কেমন যেন একটুখানি কঠোর-কঠোর হয়ে উঠল। দাদু আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী, কেমন বুঝছ?"

প্রত্যেকটা শব্দ উচ্চারণের সময় দাঁতের বাদ্য হল। দাদুর ভুরু কুঁচকে উঠল। অসুবিধে ধরে ফেলেছেন। আমি বললুম, "বেশ দেখাচ্ছে। তবে মুখটা যেন কী রকম বদলে গেল।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "বাঃ, তা দেখাবে না! যৌবন ফিরে এল যে। গালটাল সব ভরাট হয়ে গেল।"

দাদু বললেন, "সে আমি আয়নায় দেখব; কিন্তু কথা বলতে গেলে এই রকম দন্তবাদ্য হচ্ছে কেন! মনে হচ্ছে শীতকালে বরফজলে চান করে কথা বলছি।"

সত্যিই তাই। কথার পরেও কথা থেকে যাচ্ছে।

"ও মুকুজ্যেমশাই প্রথমপ্রথম একটু হবেই। নিজের দাঁত আর পরের দাঁত। তাছাড়া এতদিন মাড়ি খালি পড়ে ছিল, সেখানে হঠাৎ দাঁত এসে গেছে। অ্যাডজাস্ট করে নিতে দু-একদিন লাগবে।"

"আরে, কালই যে আমার বড় আদালতে কেস আছে! ফ্রীডাম অফ স্পীচ না থাকলে বিপক্ষের উকিল তো আমাকে পথে বসিয়ে দেবে।"

তা হলে কাল না-হয় দাঁত খুলেই সওয়াল করবেন।"

"তুমি বুঝছ না ডাক্তার, ফোকলা মুখে আইনের ভাষা ফসকে যায়, যেমন ধরো জুরিসপ্রুডেন্স, ম্যালাফাইড, লিটিগেশান, সাবজুডিস, অ্যাবরিভিয়েশান, অ্যাডজোর্নমেন্ট, অ্যালিমনি, সবই তো দন্ত্যৌষ্ঠ্য বর্ণ। দাঁত ছাড়া সওয়ালের কামড় কমে যায়। আদালত তো কামড়াকামড়ির জায়গা। পাকা নয়, ডাঁসা পেয়ারায় কামড়। কাল আবার সেশান কোর্টে লড়াই।"

"তা হলে আজ বরং আপনি বাড়ি গিয়ে ঘণ্টা তিনেক অনর্গল কথা বলে যান, যত সব শক্ত শক্ত ল্যাটিন ফরাসি, গ্রীক আর ইংরেজি শব্দ। বেছে বেছে। তারপর কাপের জলে পাটি দু'পাটি ভিজিয়ে রেখে শুয়ে পড়বেন।"

"তা পড়ব, তবে কিছু একটু চিবিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। নতুন দাঁতের স্ট্রেংথ একটু টেস্ট করে দেখব না! যেমন ধরো চালভাজা, ছোলাভাজা।"

"একেবারে অতটা শক্ত জিনিস দিয়ে বউনি করবেন? সেটা ঠিক হবে না। সবই পারবেন, তবে ধীরে ধীরে, সইয়ে সইয়ে। আজ আপনি ভাত বা রুটি খান চিবিয়ে চিবিয়ে, সজনেডাঁটা খান। তারপর ধরুন লেড়ো বিসকুটে উঠলেন। প্রথম-প্রথম কামড়াবার জন্যে দাঁত একেবারে নিশপিশ করবে। মাড়ি সুড়সুড় করবে। যতই হোক নতুন দাঁত তো। শিশুদেরও নতুন দাঁত ওঠার সময় ওই রকমই হয়। জ্বর হয়, ঘ্যানঘ্যান করে, পেট খারাপ হয়, শক্ত বিসকুট পেলে কড়মড় করে চিবোয় আঙুল কামড়ে দেয়।"

"আমারও জ্বর, পেটখারাপ হবে নাকি ডাক্তার-বাবু?"

"জ্বর হবে না, তবে পেটটা একটু সামলে' আর একটা সাবধান করে দি, দাঁত দিয়ে কোনো কিছু কামড়ে ছিঁড়ে আনার চেষ্টা করবেন না।"

"যেমন?"

"যেমন ধরুন শাঁকালুর খোলা, কিংবা হাড় থেকে মাংস, আখ। ওই কুকুরে যেমন ছেঁড়াছিঁড়ি করে না, ওই জিনিসটি চলবে না, পাটি থেকে দাঁত খুলে যাবে।"

"তা হলে আর কী দাঁত বাঁধালে তুমি?"

"আজ্ঞে এ আপনি কী বলছেন! বাঁধানো দাঁত আর নিজস্ব দাঁতে একটু তফাত তো হবেই। নিজস্ব দাঁত এক-একটা মাড়িতে দু ইঞ্চি তিন ইঞ্চি শিকড় চালিয়ে বসে আছে।"

"আচ্ছা ডাক্তার, নিমদাঁতন করা যাবে?"

"সে কী! দাঁতন কেন করতে যাবেন শুধু শুধু!"

"শুধু শুধু? নিমদাঁতন শুধু শুধু? তুমি কী বলছ ডাক্তার? ড ইউ নো হোয়াট ইজ নিম!" দাদু ভীষণ চটে উঠলেন। সিধুডাক্তার মিউমিউ করে বললেন, "আজ্ঞে না, আমি সেভাবে বলিনি, তবে এ দাঁতের তো মাজন আলাদা, তাই আর কি।"

"নিম কি শুধু মাজন, নিম হল অ্যান্টিসেপটিক, নিম ইজ এ মেডিসিন, পঞ্চবটের এক বট। আমি

বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞাপন

তোমরা যারা ছোটদের পত্রিকা নিয়মিত পড়ছো, তারা আমাদের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পরিচিত। শুধু পরিচিতই নও, তোমাদের মধ্যে অনেকেই এই বিজ্ঞাপন পড়ে সি. এম. ডি. এ.-র কাজকর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহও নিয়ে থাক। যেমন, অনেকেই আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে কলকাতা উন্নয়নের কথা জানতে চাও কিংবা ছবি এঁকে বা লেখা পাঠিয়ে তোমাদের শহর-সচেতনতার পরিচয় দিয়ে থাক। কিন্তু সেটাই কি সব?

আজ আমরা তোমাদের একটা প্রশ্ন করবো। এই যে তোমাদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া এর তো একটা খরচ আছে? নিয়মিত ভাবে এই ব্যয় বহন করার পিছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে সেটা পূর্ণ হচ্ছে কি? সোজা কথায় তোমরা কি শুধু সি. এম. ডি. এ.-র প্রচার লিখন-গুলি পড়ছো, নাকি এইসব লেখা তোমাদের মনে সত্যি করে কোন দাগ কাটতে পারছে? সত্যিকারের ভবিষ্যতের কলকাতার নাগরিককে তার নিজের শহরটা সম্বন্ধে সজাগ ও সাবধান করে তুলতে পারছে?

নইলে তো আমাদের এই লেখা কাগজের ওপরে কালির দাগ কাটা বৈ আর কিছু নয়। যদি তোমাদের মনে সামান্য দাগও কাটে তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক বলেই মনে করবো।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম ডি এ ৩-এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলিকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

এই দাঁতেই নিমদাঁতন করব, আই মাস্ট, নিম ইজ মাই হেলথ, ওয়েলথ অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ড।"

কড়কড়ে তিনশো টাকা গুনে গুনে ডাক্তারের হাতে গুঁজে দিয়ে দাদু আমার হাত ধরে উঠে পড়লেন। টেনরুপিজ এ টুথ হলে তিনশো কুড়ি হবে। কি জানি, পাইকারি দাম বোধহয় তিনশো।

বাড়ি ফিরে দাঁত পরে দাদু চেয়ারে বসলেন। মা তেল দিয়ে মুড়ি মাখছেন। প্রথমে মুড়ি চিবিয়ে দাঁত পরীক্ষা হবে। দেওকীনন্দন নারকেল ভাঙছে। দু-এক কুচি নারকেলও পরীক্ষা করবেন। বাবা এর আগে মুখ ভাল করে দেখে রায় দিয়ে গেছেন,-ন্যাচারাল টিথে আপনার ফেসকাটিং যেমন ছিল, ফলস টিথে একটু বদলে গেছে। ঠিক সে-রকমটি হল না। সামনের ঠোঁট উঁচু হয়ে আছে। সেই শার্পনেসটা নষ্ট হয়ে গেল।

ওপরের ঠোঁটে হাতের চাপ দিতে দিতে দাদু থেকে থেকেই বলতে লাগলেন, "ও একটু উঁচু আছে তো কী হয়েছে, হাতের চাপে চাপেই ঠিক করে দেব। ওটার জন্যে ভাবি না। ভাবছি খুলে না পড়ে যায়।"

মা মুড়ি দিতে দিতে বললেন, "বাঃ, বেশ হয়েছে। একবার হাসুন তো।"

দাদু লাজুক-লাজুক মুখে হাসলেন। মা বললেন, "বাঃ, কী সুন্দর হাসি। মুক্তোর মতো সাজানো দাঁতের সারি। আমাদের সকলের যদি এমন হত!"

"আমি খুব তাড়াতাড়ি অমন করে ফেলব মা। সামনের দুটো দাঁতে পোকা ধরিয়ে ফেলেছি।"

"বেশ করেছ। মাথা কিনে নিয়েছ।" মা হাত-পা নেড়ে মুখ ভেঙচালেন। দাদুকে বলে গেলেন, "বাবা, কাল থেকে নিমদাঁতন।"

দাদু বসে বসে নতুন দাঁতে মুড়ি পরীক্ষা করতে লাগলেন সঙ্গে আবার নারকেলকুচি। মনেমনে ভাবলুম, হয়ে গেল, নতুন দাঁতের আজই বারোটা। পরে জানতে পারব, এখন পড়তে বসি।

পরদিন দাদু কোর্ট থেকে ফিরে এলেন। ফর্সা রঙে কালো চকচকে কোট। কেমন মানিয়েছে! বড় আদালতে কেমন লড়ে এলেন কে জানে! দাদুর পাশে থেকে থেকে আইনের ভাষা আমিও কিছু শিখে ফেলেছি। আজ বোধহয় সেই কেসটা ছিল: ফেলারাম ভার্সাস নগেন দাস। একটা নারকেল গাছ নিয়ে দুই মক্কেলে দশ বছর ধরে লড়ে যাচ্ছে। দাদুর মুখ গম্ভীর। বেতের মোড়ায় বসে জুতোর ফিতে খুলছেন নিচু হয়ে। মা সামনে এসে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা হাতে তুলে নিতে নিতে বললেন, "কী হল বাবা? এত গম্ভীর?"

দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আর কী হল? এই দ্যাখো।" কোটের পকেট থেকে দু'পাটি দাঁত বেরোল। এ কী, দাঁত মুখ থেকে পকেটে! দুটো গোল গোল চাকতি বেরোল। "দুর করে ফেলে দিয়ে আয় আঁস্তাকুড়ে।"

মা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কী!"

দাদু ফেটে পড়লেন, "এই দাঁতের জন্যে আজ কনটেমপট অফ কোর্ট হয়ে জেলে যেতে হচ্ছিল। নগেন দাসের উকিলকে আমি একেবারে ঠেসে ধরেছি। নারকেলগাছ ফেলারামের দিকে প্রায় এনে ফেলেছি। জজসাহেবকে প্রায় বুঝিয়ে ফেলেছি। মুখ দিয়ে ইংরেজির তুবড়ি ছুটছে। হঠাৎ ওপরপাটির দাঁত ঠকাস করে খুলে পড়ে গেল টেবিলের ওপর, আর এই চাকতির একটা সুদর্শনচক্রের মতো ঘুরতে ঘুরতে সোজা জজসাহেবের কপালে লেগে তাঁর টেবিলের ওপর। হোয়াট ইজ দিস? আমি উত্তর দেবার আগেই উকিল বলে উঠলেন, দ্যাট ইজ ওয়াশার স্যার। জজসাহেব ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, কোত্থেকে এল, কে ছুঁড়েছে। তিনি বললেন, ইট কেম ফ্রম হিজ মাউথ। আপনার মুখ এঁটো করে দিয়েছে। আমি তখন আর-একপাটি দাঁত নিয়ে টানাটানি করছি। না খুলতে পারলে কথা বলতে পারছি না, ক্ষমা চাইতে পারছি না। কী অপমানজনক ব্যাপার! বিরোধী উকিল বলছেন, ইট ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ স্পিটিং অন ইওর ফেস মিলর্ড। প্রমাণ করতে চায় আমি থুতু দিয়েছি জজসাহেবের গায়ে। কেস ঘুরে কনটেমপট অফ কোর্টের দিকে চলে যায়-যায়। তখন ফোকলা মুখে শুরু করলুম। ঘণ্টাখানেক ধস্তাধস্তি করে সেই কেসকে টেনে আনলুম আমার দিকে। তরি ডবতে ডবতে ভেসে উঠল। কী অপমানজনক ব্যাপার বল তো! ফেলে দে, ফেলে দে, ওই দাঁদানো বাঁত।"

দাঁদানো বাঁত? সে আবার কী? উত্তেজনায় বাঁধানো দাঁত বলতে গিয়ে দাদু দাঁদানো বাঁত বলে ফেলেছেন। সেই দাঁত রাগ কমে যেতে দাদু পরেছিলেন। অভ্যাসও হয়ে গেল; কিন্তু দাঁদানো বাঁত আর বাঁধানো দাঁত হল না। চিরকালের মতো উলটে রইল। সোজা আর হল না। যখনই বলেন, এই ব্যাপার আমার দাঁদানো বাঁত।

ছবি দেবাশিস দেব

দেখুন...
সবচেয়ে সাদা করার জন্যে রানীপাল®

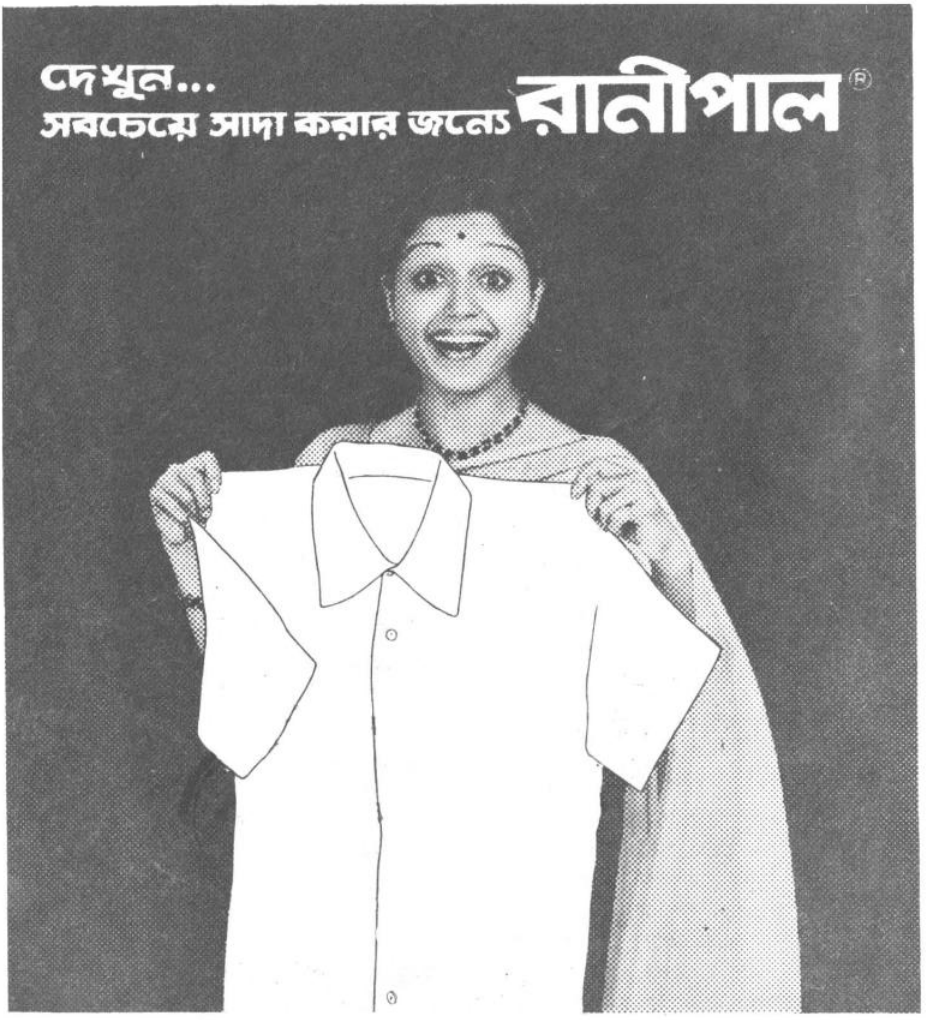

কাপড় শেষবার ধোবার আগে জলে একটু রানীপাল মেশান আর এবার দেখুন কাপড়ের ঝকঝকে সাদা ! রানীপালের সাদা ! সাদা কাপড় সে যাই হোক না কেন সুতী, সিন্থেটিক আর ব্লেণ্ডেড-রানীপাল ব্যবহারে ঝকঝকে হয়ে উঠবেই।

নিয়মিত রানীপাল লাগান... আর সাদা কাকে বলে দেখুন ও দেখান

সুতীর কাপড়ের জন্য **রানীপাল ®**
সিন্থেটিক ও ব্লেণ্ডেড কাপড়ের
জন্য **রানীপাল ® - এস**

Shilpi SG-2A/78 Ben

টুনেগাসি

শ্রীধর সেনাপতি

বড়মামার একমাত্র ছেলে আমাদের চুংকুদা কী একটা বড় রকমের সরকারি চাকরি করে। বছরের বেশির ভাগ সময় ওই কাজের জন্য চুংকুদাকে দেশবিদেশে খুউব ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয়। আর, চুংকুদা ঘুরে ঘুরে যখনই আমাদের মাঝে এসে পড়ে আমরা হৈহৈ করে তাকে ঘিরে ধরি। চুংকুদা মানেই গল্প। দেশবিদেশের, নানা রকমের।

দু'মাস বাদে আজ চুংকুদা আমাদের বাড়িতে এল। আমরাও অমনি জড় হয়ে গেলাম তাকে ঘিরে। চায়ের টেবিলেই তাকে পাকড়াও করলাম। বাবাঃ! এবারে কত দেরি করে এলে? আমরা হাজির, চুংকুদা। গল্প বলো! গল্প বলো! এবার কোথায় গিয়েছিলে, চুংকুদা?

চা-টা খাওয়া শেষ। খালি প্লেটকাপ টেবিলের একপাশে সরিয়ে রেখে চুংকুদা নিজের ডান হাতের কনুইয়ের ওপরে বাঁ হাত দিয়ে হঠাৎ চটাস্ করে এক চড় কষাল। তেতো খাওয়ার মতো মুখ করে চিবিয়ে চিবিয়ে গম্ভীর গলায় বলে উঠল, "টুনেগাসি!"

শুনে আমাদের উৎসাহ যেন একটু থমকে গেল। সে আবার কোন্ জায়গা? ভূগোলের কোন পাতায় লেখা রয়েছে? নাকি নতুন কোন ধাঁধা আমদানি করল চুংকুদা আমাদের জন্যে? আমরা সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, এমন সময়ে কুমকুম বলে উঠল, "ও, তুমি আমাদের টুনোমাসি'র কথা জিজ্ঞাসা করছ বুঝি চুংকুদা? টুনোমাসি দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছিলেন, চলে গেছেন।"

চুংকুদা ওর বাঁ হাতখানা আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরল। দেখি, হাতে একটু রক্তের ছিটে। আর বড় একটা মশার চ্যাপ্টা মৃতদেহ।

সেটা দেখিয়ে চুংকুদা বলল, "দেখেছিস? টুনেগাসি।"

ও! টুনেগাসি তাহলে কোনো জায়গার নাম নয়। আমাদের টুনোমাসির কথাও শুধোয়নি চুংকুদা। বলেছে একটা মশার কথা। মশাকে ইংরেজিতে বলে মস্কুইটো। টুনেগাসি আবার কোন্ দেশী ভাষা রে বাপ! আকাশ-পাতাল ভাবছি!

মরা মশাটিকে হাত থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চুংকুদা বলল, "টুনেগাসি জব্দ হয়েছিল একটা খুব তেজী পালোয়ান ছেলের হাতে। সাইবেরিয়ার নাম শুনেছিস তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই!" আমরা একযোগে মাথা দুলিয়ে উৎসাহের সঙ্গে বলি। ভূগোলে ওদেশটার কথা রয়েছে। তুমি বলে যাও, চুংকুদা। তারপর?"

চুংকুদা শুরু করল, "এ অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। সাইবেরিয়ার উপকথায় আছে। টুনেগাসি ছিল এক

হাঁউমাঁউখাঁউ দুর্দান্ত রাক্ষস! তার অত্যাচারে মানুষ শুধু ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ত। রাক্ষসটা হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত মানুষের ওপরে। কেউ তাকে প্রতিরোধ করার সুযোগই পেত না। যেমন সে আচমকা আসত, তেমনি দু-একটা মানুষকে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যেত চোখের পলক পড়তে না-পড়তে। দেশের মানুষ টুনেগাসির ভয়ে থরহরি কম্পমান। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে তারা বসে থাকত দিনরাত। কিন্তু তাতেও কি রেহাই পেত? না! একটা-না-একটা মানুষকে সে তুলে নিয়ে যেতই বেপরোয়াভাবে।

"একদিন একটি ছোট ছেলে, তোদের বয়সি, কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল নিজের গ্রামঘর ছেড়ে। টুনেগাসি তার বাবা-মা দুজনকেই মেরে ফেলেছিল। অনেক অনেক দূরে গিয়ে ছেলেটি আশ্রয় পেল এক জায়গায়। সেখানে সে বড় হতে লাগল। ব্যায়াম কুস্তি করে ইস্পাতের মতো গড়ে তুলতে লাগল নিজের শরীরটাকে। তারপর একদিন রাক্ষসটার সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া করে নিতে চাইল সে। হিংস্র রাক্ষসটা দেশের অনেক মানুষের সঙ্গে তার বাবা-মাকেও মেরে রক্ত খেয়েছে। এর প্রতিশোধ তো একটা নিতেই হবে, নিরীহ মানুষদেরও উদ্ধার করা যাবে রাক্ষসটার কবল থেকে।

"এখন, ওই রকম একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে তো দেশে ফিরে এল তেজী পালোয়ান ছেলেটি। এখন সে যুবক। কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো সঙ্গে সঙ্গে টুনেগাসির দেখা মেলে না। সে কোথায় লুকিয়ে থাকে কেউ জানে না। তার খিদে পেলেই সে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ মানুষের ঘাড়ে। রক্ত চুষে খায়। তাই ছেলেটি লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল টুনেগাসির হঠাৎ আর্বিভাবের জন্যে।

"সময় কাটে। সময় কাটে। তারপর হঠাৎই একসময়ে ওই গ্রামে হাঁউমাঁউ করে ছুটে এল টুনেগাসি। আর, অমনি বেপরোয়া নির্ভীক ছেলেটি ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। বেধে গেল একটা মরণপণ লড়াই। বাড়িঘর গ্রাম মাঠ বনজঙ্গল কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়তে লাগল টুনেগাসি। দিন কেটে গেল, রাত কেটে গেল। লড়াই তবু থামে না। তুমুলভাবে চলছেই! হঠাৎ এক সুযোগে ছেলেটির তলোয়ার সজোরে বসে গেল টুনেগাসির থামের মতো মোটা ঘাড়ে। টুনেগাসি মাটিতে গড়াগড়ি। পরমুহূর্তেই ফের সে খাড়া। আবার ছেলেটির হাতের তলোয়ারের কোপ পড়ে টুনেগাসির মাথায়। টুনেগাসি মাটিতে পড়েই সঙ্গে সঙ্গে ফের উঠে দাঁড়ায়। এমনি বারবার ঘটে। রাক্ষসটার যেন কিছুতেই মৃত্যু নেই। এই মরে, এই বেঁচে ওঠে!

"এ রাক্ষসকে খতম করা সহজ কর্ম নয়! ছেলেটি সেটা বুঝতে পেরে টুনেগাসির সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু করল জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে। আসলে ছেলেটির ছিল অন্য উদ্দেশ্য। সে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরেঘুরে আগুন জ্বেলে দিতে লাগল। আগুন তো সর্বগ্রাসী। এক সময়ে দেখা গেল টুনেগাসিকে ঘিরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে সারা জঙ্গল জুড়ে। এবার টুনেগাসি ভয় পেল। রণে ভঙ্গ দিয়ে সে পালিয়ে যেতে চাইল আগুনের ভেতর দিয়েই। পারল না। আগুনের ভেতরে তার রাক্ষুসে মুখ একবার হাঁ করে একবার বন্ধ হয়। ছেলেটি আগুনের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পায়—টুনেগাসি ওইভাবে মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বলছে: আমি মরেও বেঁচে থাকব। মানুষ জাতিকে আমিও চিরকাল জ্বালিয়ে যাব। তাদের রক্ত আমি চিরকাল খাবই। আমার হাত থেকে তারা কোনোদিন রেহাই পাবে না।

"দেখতে দেখতে আগুনে ছাই হয়ে গেল টুনেগাসির বিশাল দেহটা। আর, ঠিক সেই সময়ে সেখানে ধেয়ে এল প্রচণ্ড ঝড়, শূন্যে উড়িয়ে দিল টুনেগাসির শরীরের ছাইভস্ম। সেই ছাইভস্ম বাতাসে ভর করে ছড়িয়ে গেল পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জায়গায়। আর তার প্রতিটি কণা অণুকণা থেকে জন্ম নিল এক-একটি মশা, খুদে রাক্ষস! অর্থাৎ...."

আর-একটি মশা বসেছিল বুকাইয়ের কপালে। ঝিমলি সেটাকে লক্ষ করে চটাস করে এক চড় বসিয়ে দিল। আমরা হৈহৈ করে হাততালি দিয়ে সমস্বরে বলে উঠলাম, "পাজি টুনেগাসি।"

চুংকুদা হাসিমুখে মাথা ঝুঁকিয়ে সমর্থন জানাল আমাদের।

ছবি: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা : গবাকে কেউ বলে পাগল, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ চোর, কেউ স্পাই। উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের কর্মচারী নয়নকাজলও লোভী। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক আহত, তার জায়গায় যুধিষ্ঠির পড়াচ্ছেন। গবার ঘরে মাঝরাত্তিরে যে ঢুকেছিল, তার মুখে জর্দার গন্ধ। যুধিষ্ঠিরও জর্দাপান খান। সার্কাসে যে-লোক মুখোশ পরে রোমহর্ষক খেলা দেখায়, সে-ই কি ফেরারি গোবিন্দ মাস্টার? গোপনে তার পরিচয় জানতে তাঁবুতে ঢুকে দারোগা আক্রান্ত। সকালে তাঁবুতে এসে গবা জানায়, গোবিন্দ মাস্টার খড়ের গাদায় পৌঁছেছে। কাকাতুয়া বলে, "রামু, পড়তে বোসো।" রামু পাখিকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে ঠোঁটের ঠোক্কর খায়। বাবাও তাকে বেত মেরেছেন।। দুঃখী রামুকে গবা গল্প শোনায়। কাশিমের চরের ভয়ঙ্কর রাত্রির গল্প। তারপর···

।। ১২।।

বিরক্ত হয়ে রামু বলে, "আঃ, বলোই না!"

"ভাবলে আজও গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যায়। দ্যাখো না, আমার গা দ্যাখো!" বলে গবা হাতে দাঁড়ানো রোঁয়া দেখাল রামুকে। তারপর বলল, "কুয়াশা আর জ্যোৎস্নার মধ্যে ঝোপেঝাড়ে সেই লুকোচুরি খেলা চলছে, আর আমি বসে আছি। ব্যাপারটা কী তা বুঝতে পারছি না। একবার হঠাৎ একটা শেয়াল এক ঝোপ থেকে বেরিয়ে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফ মেরে সাঁ করে ছুটে পালাল।

"তারপর?"

তারপর সেই ঝোপের আড়াল থেকে ধুতি পরা একটা লোক র‍্যাপারে মুখ ঢেকে কুঁজো হয়ে বেরিয়ে এসে অবিকল শেয়ালের মতোই দৌড়ে পালাচ্ছিল। তার চেহারাটা বিশাল। ছ ফুটের ওপরে লম্বা, ইয়া কাঁধ, ইয়া বুকের ছাতি। সেই ঝুঝকো আলোয় মুখঢাকা লোকটাকেও কিন্তু আমি চোখের পলকে চিনে ফেললাম।"

"লোকটা কে?"

"সেই লোকটাই পাড়ুই। ওরকম লোক আমি জন্মে দুটো দেখিনি। হরিহর পাড়ুই না-পারে এমন কোনো খারাপ কাজ নেই। লোকের ছেলেমেয়ে চুরি করে আড়কাঠিদের কাছে বেচে দিত, নয়তো মা-বাপের কাছ থেকে টাকা আদায় করত। ডাকাতি করত। চুরি করত। আর খুন করা ছিল তার জলভাত। ওই তল্লাটে তার দাপটে সবাই কাঁপত।"

"লোকটা কী করল?"

"লোকটা তখন পালাচ্ছিল। খুব অদ্ভুত দৃশ্য। হরিহর পাড়ুইকে পালাতে দেখাটাও ভাগ্যের ব্যাপার। কারণ সাধারণত তাকে দেখেই অন্যেরা পালায়। তাই তাকে পালাতে দেখে ভারী অবাক লাগল। কাশিমের চরে এমনিতে ঘরবাড়ি নেই, তবে বহুকাল আগেকার একটা ভাঙা বাড়ি আছে। সাপখোপ শেয়াল তক্ষক বাদুড় আর প্যাঁচার আড্ডা। চোরে-ডাকাতেও বড় একটা কেউ সেই বাড়িতে ঢোকে না। আমি যেখানে বসে ছিলাম, সেখান থেকে একটু ডাইনে কোনাকুনি একটা ঝাউবন। তার আড়াল থেকে সেই ভাঙা বাড়িটার একটা গম্বুজ দেখা যাচ্ছিল। নিকষ্যি অন্ধকার। হরিহর পাড়ুই কোলকুঁজো হয়ে সেই ঝাউবনের মধ্যে ঢুকে বাড়িটার দিকে যাচ্ছে বলে মনে হল। এমন সময়ে দেখি, গম্বুজে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। কে যেন উঁচু থেকে একটা টর্চবাতি জ্বালছে আর নেভাচ্ছে। আমার মনে হল, ব্যাপারটা একটু দেখা দরকার।"

"তোমার ভয় করল না?"

"না, ভয়ের কী? দুনিয়াটাই তো নানা খারাপ জিনিসে ভরা। ভয় পেতে শুরু করলে তার আর শেষ নেই।"

"তুমি কী করলে?"

"উঠে হরিহরের পিছু-পিছু এগোতে লাগলাম। সেটাও দুঃসাহসের কাজ। হরিহর যদি টের পায় তাহলে চোখের পলকে আমার ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে দেবে কসাই-ছুরি দিয়ে। তার কাছে সব সময় অস্ত্রশস্ত্র থাকে। স্বভাবটাও কেমন পাগলা খুনির। তাই খুব ঠাহর করে দেখে-শুনে সাবধানে এগোতে হচ্ছিল। কিন্তু ঝাউবনের মধ্যে আলোআঁধারিতে আর তাকে দেখতে পেলাম না। গম্বুজের বাড়িটাও আর জ্বলছে না তখন।"

রামু চোখ বড়-বড় করে বলে, "তখন কী করলে?"

"কিছু করার নেই। চারদিকে ঠাহর করছি। লোকটা তো আর নেই হয়ে যেতে পারে না! ঝাউবনে প্রথম দিকটায় বেশ পরিষ্কার। ঝোপজঙ্গল

তেমন নেই। কিন্তু ভিতর দিকটায় মেলা আগাছা হয়েছে। লুকিয়ে থাকার পক্ষে তোফা জায়গা। আমি একটা কাঁটাঝোপের কাছাকাছি ঘাপটি মেরে বসে চারদিকে দেখছি, এমন সময়—"

"এমন সময়? উঃ, বলো না!"

"বলছি দাঁড়াও। হাঁ করতেই গলায় একটা মশা চলে গেল যে!" খক-খক করে কেশে গলা সাফ করে গবা বলে, "বেশ নিঃঝুম। আলোর চিকড়ি-মিকড়ি। শীত। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একটা লম্বা হাত কোত্থেকে বেরিয়ে এসে ঘপাত করে আমার ঘাড়টা ধরল।"

"বলো কী?"

"ওরে বাবা, সে-কথা ভাবতে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। এই দ্যাখো ফের গায়ের রোঁয়া দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।"

"তারপর কী হল?"

"আমি তো কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। আর হাতটাও পেল্লায়। এই মোটা-মোটা আঙুল, কুলোর মতো মস্ত পাঞ্জা। সেই হাতের একটু বেকায়দা বেশি চাপ পড়লে আমাদের মতো সাধারণ ঘাড় মট করে ভেঙে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, হাতটা আমার ঘাড় ধরল বটে, কিন্তু তেমন আঁট করে ধরল না। বরং মনে হচ্ছিল, মস্ত হাতটা আমার কাঁধে বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু আমি সেই ভাবেই তখন কুঁই-কুঁই করছি। টের পেলাম হাতটা সামনের কাঁটাঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে আমার ঘাড় ধরেছে। হাতটা মানুষের না অন্য কিছুর তা তখনো বুঝতে পারছি না।"

"মানুষ নয়?"

"তখন তা বুঝবার মতো মনের অবস্থা নয়। তবে হঠাৎ ঝোপের ভিতর থেকে একটা ঘসঘসে শ্বাস টানার শব্দ পেলাম। আমি তখন ভয়ে একেবারে পাথর। হঠাৎ সেই পেল্লায় হাত আমার ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আস্তে-আস্তে ঝোপটার মধ্যে টেনে নিতে লাগল। সাঙ্ঘাতিক কাঁটাঝোপে আমার গাল নাক কান ছড়ে যাচ্ছে, চোখেও কাঁটা ঢুকে যেতে পারে। আমি দুহাত দিয়ে চোখটা আড়াল করলাম। তারপর ডালপালা-সমেত মুখ থুবড়ে পড়লাম মাটিতে। দেখি কী, কাঁটাঝোপের মধ্যে একটা লোক শুয়ে আছে। চারদিক রক্তে ভেজা।"

"ওঃ বাবা!"

"বাবা বলে বাবা! আমি তো তখন বাবা ছেড়ে ঠাকুর্দাকে ডাকতে লেগেছি।"

"হল কী বলো না!"

"তেমন কিছু নয়। লোকটার তখন প্রায় হয়ে গেছে। বুকে মস্ত একটা ক্ষত। তা থেকে বগবগ করে রক্ত পড়ছে। লোকটার গলায় ঘড়ঘড়ানি উঠে গেছে। লোকটা কোনোক্রমে বলল, পাখি জানে। পাখি সব জানে। এইটুকু বলেই লোকটা ঢলে পড়ল।"

"লোকটা কে?"

"আর কে? সেই হরিহর পাড়ুই। তখনো মরেনি, কিন্তু মরছে। কিন্তু আমার অবস্থা তখন সাঙ্ঘাতিক। মরার সময় কী করে জানি না পাড়ুইয়ের হাতটা আমার ঘাড়কে শক্ত করে ধরল। কিছুতেই ছাড়াতে পারি না। ওদিকে কাছাকাছি অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কারা যেন এগিয়ে আসছে। চারদিকে টর্চের বাতি ঝলসাচ্ছে ফটাফট। যারাই হোক, তারা লোক ভাল নয়। আমার পালানো দরকার। কিন্তু হরিহরের হাতখানা আমাকে অষ্টপাশে বেঁধে ফেলেছে। কার সাধ্য ছাড়ায়! তার ওপর আঙুলগুলো ক্রমে বেঁকে গলায় গজালের মতো ঢুকে যাচ্ছে। মরন্ত মানুষের গায়ে যে অত শক্তি হয় কে জানত বলো।"

"তারপর কী হল? তাড়াতাড়ি বলো।"

"ওদিকে সেই বদমাশগুলোও তেড়ে আসছে। চারদিকে টর্চের আলো ঝলসাচ্ছে। একটা লোক চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, সাতনা, ঠিকমতো বল্লম চালিয়েছিলি তো! অন্য একজন রাশভারী গলায় বলল, আমার বল্লম এদিক-ওদিক হয় না। ঝাউবনে ঢুকবার মুখেই লোকটাকে গেঁথেছি। তবে দানোটার গায়ে খুব জোর। বল্লমটা ধাঁ করে টেনে খুলেই দৌড়ে পালাল। কিন্তু মনে হয় না বেশি দূর যেতে পারবে। চারদিকে রক্তের ছড়া দেখছ না!"

"তখন তুমি কী করলে?"

"আমি? আমি তখন কিছু করাকরির বাইরে। হরিহরের কব্জায় আমার পুঁটিমাছের পরান ধড়ফড় করছে। আস্তে-আস্তে চেতন-ভাবটা চলে যাচ্ছে। শ্বাস প্রায় বন্ধ। ঠিক এই সময়ে লোকগুলো 'ঐ যে' বলে চেঁচিয়ে উঠল। পর মুহূর্তেই সবাই এসে ঘিরে ধরল আমাদের।"

"তুমি বেঁচে গেলে বুঝি!"

"আরে দূর! অত সহজ নাকি? লোকগুলো টর্চ জ্বেলে দৃশ্যটা দেখেই চেঁচিয়ে বলে উঠল, এখনো বেঁচে আছে! সর্বনাশ। শেষ করে দে। শেষ করে দে। বলতে বলতে একটা লোক মস্ত দা বের করে প্রথম কোপটায় হরিহরের গলা নামিয়ে দিল।"

"বলো কী? আর তুমি?"

"আর যারা ছিল তারা বলল, এ লোকটা কে রে? আর-একজন বলল, যেই হোক, সাক্ষী রেখে লাভ নেই। লোকটা বেঁচে আছে। গলাটা নামিয়ে

দে। সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা লোক ঘচাত করে আমার গলাটাও নামিয়ে দিল।"

"যাঃ, কী যে বলো!"

"যা বলছি শুনে যাও। একেবারে প্রত্যক্ষ ঘটনা, দুনিয়ার আর কোনো মানুষের এমন অভিজ্ঞতা নেই। স্পষ্ট নিজের কাটামুণ্ডু প্রত্যক্ষ করলাম। বুঝলে! গলা দিয়ে ফোয়ারার মতো রক্ত পড়ছে। ধড়টা একটু ছটফট করছে। কিন্তু মুখখানা দিব্যি হাসি-হাসি।"

"গুল মারছ গবাদা!"

"সত্যি না। তাপর হল কী শোনো না। সে এক কাণ্ড।"

"বলো।"

"ওরা তো আমাদের কবন্ধ করে রেখে পালিয়ে গেল। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসলাম। বারবার গলায় হাত বোলাচ্ছি। কিন্তু সেটা তো আমার গলা নয়। শরীরটা তখন বাতাসের মতো হালকা পাতলা জিনিস হয়ে গেছে। দেখি ঝোপের ওপাশ থেকে হরিহর প্যাড়ুইও উঠে পড়ে চারদিকে কটমট করে চাইছে। তার চাউনি দেখে ভয় খেয়ে পালাতে গিয়ে মনে হল, এখন আর ওকে ভয় কী? আমিও একটু ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। হরিহর আমাকে পছন্দ করছিল না। কাছে যেতেই একটা হুংকার দিল, খবরদার! আমি খিক করে হেসে বললাম, তোমার আর সেই দিন নেই হে হরিহর। মাথা গরম কোরো না বাবা। তার চেয়ে চলো চাঁদের আলোয় চরে বেড়াতে-বেড়াতে দুটো সুখদুঃখের কথা কই। হরিহর প্রথমটায় একটু গোঁ ধরে ছিল। তারপর যখন সত্যিই বুঝল যে, সে মরে গেছে, তখন আমার সঙ্গে মিশতে আপত্তি করল না তেমন।"

"মরে গিয়ে তুমি ফের বেঁচে উঠলে কী করে?"

"সে তো আর-এক গল্প। আলফা সেনটরের গ্রহ থেকে যাদের আসবার কথা ছিল, তারা ভোর-রাত্রে এসে আমার দশা দেখে চটপট মাথাটা জুড়ে দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলল যে।"

"যত সব গুল। কিন্তু পাখি কী জানে তা তো বললে না?"

"হ্যাঁ। সেইটেই তো আসল গল্প। আর একদিন হবেখন।" (ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

শিশিরকুমার বসু

(২৫)

১৯৩৭-৩৮ সালে গান্ধীজি ও জওহরলাল তো কলকাতায় আমাদের বাড়িতে থাকতেন। তা ছাড়া সেই সময় দেশের অন্যান্য বড়বড় নেতাদেরও বেশ কাছ থেকে দেখা যেত। এ-সুযোগ কে ছাড়তে চায়। ১৯৩৭-এর কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় একটা প্রধান আকর্ষণ ছিল মঞ্চে একসাথে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতি। অটোগ্রাফ সংগ্রহের জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। জওহরলাল ও রাঙাকাকাবাবুকে ঠিক সময়ে ধরতে পারলে অটোগ্রাফ পেতে বিশেষ অসুবিধা হত না।

গান্ধীজির বেলায় কিন্তু নিয়ম ছিল একেবারে অন্যরকম। পাঁচটা টাকা অটোগ্রাফের খাতার ভিতরে গুঁজে দিয়ে তবেই জমা দিতে হত, রোজই অটোগ্রাফের বইয়ের স্তূপ ঘরের এককোনায় দেখা যেত। এই ভাবে গান্ধীজি হরিজন ফাণ্ডের জন্য টাকা তুলতেন। দর্শন করতে এসে অনেক মহিলাও গয়না খুলে গান্ধীজির হাতে সমর্পণ করে যেতেন। কোনো-কোনো অটোগ্রাফপ্রার্থী আবদার করতেন যে, ইংরেজি অক্ষরে গান্ধীজির সই চাই। এ-সব ক্ষেত্রে বিশেষ আরজির প্রয়োজন হত। মনে আছে, একদিন বিশেষ কোনো অটোগ্রাফপ্রার্থীর হয়ে সাহস করে ওঁর কাছে গিয়ে বললাম যে, তিনি যেন দয়া করে দেবনাগরীতে না লিখে ইংরেজিতে সই করে দেন। নাকের ডগায় চশমার উপর দিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন গান্ধীজি, তারপর মুচকি হেসে বললেন যে, সেবারকার মতো তিনি ইংরেজিতে সই করে দিচ্ছেন, কিন্তু 'ইফ এনিবডি এল্‌স এগেন আসকস্‌ ফর অ্যান অটোগ্রাফ ইন ইংলিশ, প্লীজ টেল হিম দ্যাট দি চার্জ ইজ টেন রুপিজ, অ্যাণ্ড নট ফাইভ।'

লক্ষ করার বিষয় যে, দেশের কাজে দেশবাসীর কাছে কোনো দাবি রাখতে মহাত্মা গান্ধীর দ্বিধা ছিল না। পরে যেমন আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সময় রাঙাকাকাবাবু পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের কাছে দেশের মুক্তির জন্য সর্বস্ব দাবি করেছিলেন—সব ত্যাগ করে ফকির হতে বলেছিলেন।

আগেই তো বলেছি, যতই গান্ধীজিকে কাছ থেকে দেখতে লাগলাম, ওঁর অসাধারণত্ব ততই প্রকট হতে লাগল। কেবল অসাধারণত্ব নয়, অভিনবত্বও বটে। ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনে তিনি কোনো কিছুই পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি সোজাসুজি ডাক্তার বিধান রায় বা নতুনকাকাবাবু ডাক্তার সুনীল বসুকে বলে দিতেন যে, পাশ্চাত্ত্যের চিকিৎসা-পদ্ধতি তাঁর কাছে গ্রাহ্য নয়। বেশি রসুন খাওয়া নিয়ে আপত্তি করলে জবাব দিতেন যে, তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন সেটা তাঁর পক্ষে ভাল, তাঁর ব্লাড প্রেশার ঠিক রাখে। গঙ্গার ঘাট থেকে মাটি আনিয়ে কাপড়ের মধ্যে পুরু করে প্রলেপ তৈরি করে কপালে ও পেটের উপর রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকতেন। বড় বড় ডাক্তারেরা হাঁ করে দেখতেন। অন্যদিকে আবার কয়েকটি ব্যাপারে তিনি বৈজ্ঞানিক রীতিনীতিও মেনে চলতেন। যেমন, তাঁর জন্য আনা শাকসব্জি জীবাণুমুক্ত করার জন্য পোটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট মেশানো জলে ভিজিয়ে রাখা হত। শরীর ভাল রাখার জন্য তিনি একটি বিখ্যাত জার্মান কোম্পানির গ্লুকোজ খেতেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তিনি খুবই কড়াকড়ি করতেন। বাবা গান্ধীজির জন্য রাতারাতি তাঁর ঘরের পাশের বাথরুমে বিশেষ কয়েকটি ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাথরুম পরিষ্কার রাখার ভার গান্ধীজি কাউকে ছাড়বেন না। গৃহস্বামী যতই বিব্রত হোন না কেন, নিজের বাথরুম গান্ধীজি নিজের হাতে পরিষ্কার করবেনই।

গান্ধীজির খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাদি করতেন আমার মা ও বোন গীতা। যোগাড় দিতেন আমাদের মাসতুতো দাদা রবীন্দ্রকুমার ঘোষ, যাঁকে সকলেই 'ডাঁটিদা' বলে জানত। ডাঁটিদা গান্ধীজির জন্য কলকাতার বাজার তোলপাড় করে

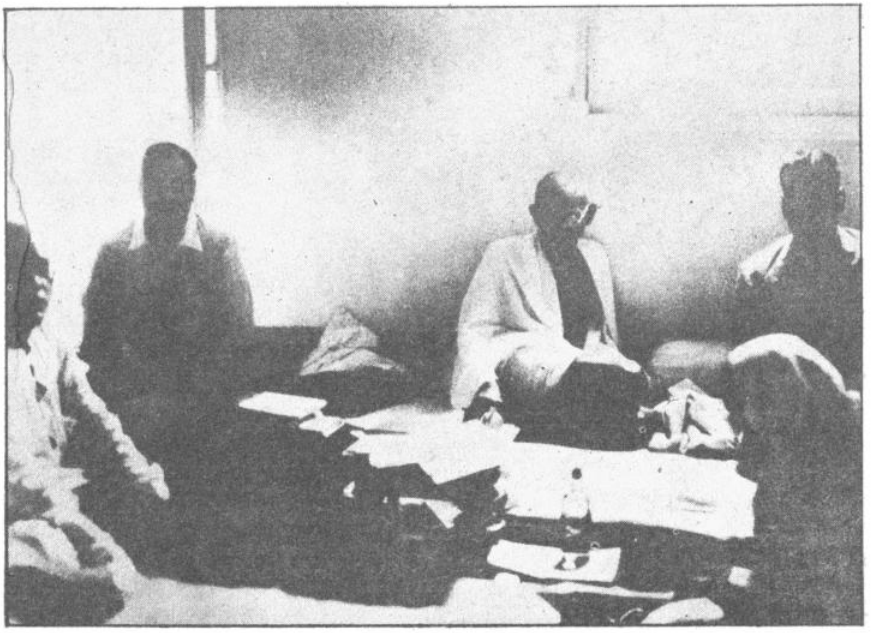

উডবার্ন পার্কের বাড়িতে, দোতলার ঘরে। (বাঁ দিক থেকে) শরৎচন্দ্র, ডঃ রায়, গান্ধীজি, নতুনকাকা সুনীলচন্দ্র ও বিভাবতী দেবী

সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যা আছে এনে হাজির করতেন। এ-ব্যাপারে কেউ কোনো সমালোচনা করলে ডাঁটিদা বড়ই দুঃখ পেতেন। জানতে পারলে গান্ধীজি কিন্তু ডাঁটিদার পক্ষে এগিয়ে আসতেন। বলতেন, "রবিবাবু আমার জন্য বাজারের সেরা জিনিস আনেন।" তাঁর সম্বন্ধে যে-কেউ কিছু ভাল বললেই ডাঁটিদা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তেন, চোখে জল এসে পড়ত। এই সূত্রে ডাঁটিদা সম্বন্ধে আরও কিছু বলি। এমন প্রাণখোলা পরোপকারী মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। বিশেষ করে গান্ধীজি আমাদের বাড়িতে আসার সময় থেকে বাবা মা ও আমাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, মাত্র কয়েক বছর আগে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেটা বজায় ছিল। মনে হত যেন কেবল অন্যের কাজ হাসিমুখে করবার জন্যই বিধাতাপুরুষ ডাঁটিদাকে এ-জগতে পাঠিয়েছিলেন। সেই থেকে সুদিনে ও দুর্দিনে উডবার্ন পার্কের বাড়িতে তিনি প্রায় রোজই আসতেন; যেমন সব রকম কাজের ভার নিজে থেকেই নিতেন, তেমনি জমিয়ে আড্ডাও দিতেন। বাবা তাঁকে ডাকতেন দোটি-মহারাজ' বলে, বাবার প্রতি আনুগত্যে তাঁর কোনোদিন হেরফের হয়নি। যুদ্ধের সময় যখন আমি সুদূর পাঞ্জাবে বন্দী, তখন মার কাছে লুকিয়ে একটি চিঠি পাঠাবার সময় আমি ডাঁটিদার ঠিকানা ব্যবহার করার কথা ভেবেছিলাম। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর কাজে তিনি শেষদিন পর্যন্ত তাঁর অকুণ্ঠ ও সহৃদয় সাহায্য দিয়ে গেছেন।

কলকাতায় গান্ধীজির অন্যান্য কাজের মধ্যে একটা বিশেষ কাজ ছিল। বাংলার রাজবন্দীদের নিয়ে ব্রিটিশ সরকার বড়ই বেগ দিত। কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা হলে তারা অহিংস সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তি দিলেও বাংলার বিপ্লবী রাজবন্দীদের সহজে ছাড়তে চাইত না। এ-বিষয়ে রাঙাকাকাবাবুর মনোভাব ছিল খুব কঠিন ও পরিষ্কার। তাঁর মত ছিল যে, যখনই যুদ্ধবিরতি হবে, সব রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে হবে, হিংসা-অহিংসার অজুহাত দিয়ে এই নীতির ব্যতিক্রম করা চলবে না। ব্রিটিশ সরকারের উপর এই ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করার জন্য তিনি গান্ধীজির সহযোগিতা চান। গান্ধীজি কলকাতায় এসে একদিকে ইংরেজ গভর্নরের সঙ্গে কথা বলছিলেন, অন্যদিকে জেলে গিয়ে আমাদের বিপ্লবী বন্দীদের সঙ্গে দেখা করছিলেন। গান্ধীজির ও বাবা-রাঙাকাকাবাবুর এ-ব্যাপারে কাজের ধারাটা ঠিক একরকম না হলেও, উদ্দেশ্য ছিল এক। শেষ পর্যন্ত সমস্যার একটা সুরাহা হয়, বেশির ভাগ বন্দী মুক্তি পান, এবং তাঁরা কংগ্রেসে সামিল হয়ে জাতীয়

ডেট কেক ব্যবহার করুন, সাদাকে আপন করুন

আজ, আগের থেকেও বেশী লোক ডেট কেকের দারুণ ধোয়া পছন্দ করছেন; ওঁরা বলেন, এটি যেমন চোখ ধাঁধানো সাদা করে, তেমনি অনেক বেশী সাশ্রয়ও পড়ে।

ডেট কেক

Shilpi-DM-41 A/80 Ben.

আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

১ নং উডবার্ন পার্কে আমাদের বাড়িতে দুই মহামানবের মিলন হয়েছিল দু'বার। গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ। একবার আমি তো সাক্ষীই ছিলাম, অন্যবার একটা বিপদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে দেখতে ছুটে এসেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ খবর এল, রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাড়িতে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ উপরে উঠতে পারবেন না। গান্ধীজি তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। একতলায় যে-ঘরটা পণ্ডিতজির ঘর বলে চিহ্নিত ছিল, সেই ঘরে দুজনের দেখা হল। যাবার সময় হলে গান্ধীজি নিজের হাতে করে রবীন্দ্রনাথের চটিজোড়া এগিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ চলে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে ক্যামেরা-ট্যামেরা নিয়ে সাংবাদিকরা এসে পড়লেন, কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল।

অন্যবার যখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, তখন গান্ধীজি খুবই অসুস্থ, রক্তের চাপ অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। সারা বাড়ি থমথম করছে। বাবা, রাঙাকাকাবাবু, জওহরলাল চিন্তায় আকুল। ডাক্তার রায় ও নতুনকাকাবাবু অস্থির হয়ে যা করতে পারেন করছেন। গান্ধীজি তখন দোতালায় বাবার ঘরে রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজিকে দেখতে আসতে চাইলেন। এবার তাঁকে চেয়ারে করে উপরে তুলতে হল। চেয়ার বহন করলেন সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু, শরৎচন্দ্র বসু ও মহাদেব দেশাই। (ক্রমশ)

পাখির বাসার ঝোল

কত অদ্ভুত খাবারের কথাই না তোমরা শুনেছ। কিন্তু কখনও শুনেছ কি যে, মানুষ পাখির বাসা রান্না করে খায়। মালয়, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি স্থানে 'স্যালানগেনস' নামে এক বিচিত্র পাখি আছে। এরা দেখতে আমাদের দেশের তালচঞ্চু পাখির মতো। শুধু থুতু দিয়ে বাসা তৈরি করে এরা। সাধারণত পাহাড়ের গুহার ভেতর বাসা বানায়। বাসা তৈরি করার সময় এরা একটা পাথরের খাঁজে বসে ক্রমাগত মুখের লালা বার করতে থাকে আর মাথাটা চক্রাকারে ঘোরায়।

শংকরলাল সাহা

তিন্নির ভাবনা

নৃপেন্দ্র সান্যাল

ঘুমে ভারী চোখদুটো
খুলতে চায় না, এই ভোরে
সূর্যটা তবু কেন
আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ে?

সূর্যটা অদ্ভুত!
দুই চোখে ঘুম নেই,
সন্ধে হতে-না-হতে গঙ্গায়
ডুব দেয়। সাঁতরিয়ে চলে যায়
বোম্বাই। আরো পশ্চিমে। সেই
নরওয়ে ডেনমার্ক সুইডেনে।
ফিরে আসে আবার এখানে;
সারারাত জেগে শেষে
নিয়মিত ঠিক পাঁচটায়,
ঘড়ি যেন ঝোলানো গলায়।

সূর্যের ছুটি নেই
রোজ ভোরে ওঠা কেন তার?
সূর্য উঠলে পর রাত্রিও শেষ হয়
যায় না ঘুমিয়ে থাকা আর।

ঘড়িকে পিছিয়ে দিয়ে
সূর্যটা শুয়ে থাক, ডুবে থাক ঘুমে,
কাজ নেই, আলোর ফুলকি তুলে
ছুটোছুটি রোদ নিয়ে
সারাদিন-সারারাত
পুবের আকাশ থেকে আরো পশ্চিমে।

ছবি দেবাশিস দেব

॥ ১৯ ॥

আর-পাঁচজন তরুণ ফুটবলারের মতো আমারও স্বপ্ন ছিল, একদিন অলিম্পিকের আসরে ভারতের হয়ে খেলব। উনিশশো পঞ্চান্নয় ঢাকায় কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে ভাল খেলায় ছাপ্পান্নর মেলবোর্ন অলিম্পিকে দলে থাকার সম্ভাবনা জোরালোই ছিল। কিন্তু সেবার সন্তোষ ট্রফিতে হেরে যাওয়ার পর ভয় হল, এরপর বাংলার খেলোয়াড়দের অবহেলা করা হবে না তো? সন্তোষ ট্রফি খেলে কেরলের সীমানা পেরিয়ে মাদ্রাজ স্টেশনে পৌঁছে খবরের কাগজে দেখলাম, অলিম্পিক ট্রায়ালের জন্য ছত্রিশ জন ফুটবলারের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ছত্রিশজনের মধ্যে ষোলজনই বাংলার। বুঝলাম, দুর্ভাগ্যবশত হেরে গেলেও আমরা নির্বাচকদের আস্থা হারাইনি। মাদ্রাজ স্টেশনে কফি খেতে খেতে ভাবছিলাম, কোনভাবেই যেন মেলবোর্ন অলিম্পিকের দল থেকে বাদ না পড়ি, সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। বাংলার ম্যানেজার সরোজ বাবু ঠাট্টা করে বললেন, "কীরে, ইণ্ডিয়া ট্রায়ালে চান্স পাওয়ার আনন্দে তোরা বাংলার হারার দুঃখ ভুলেই গেলি!"

রহিম সাহেব

কলকাতায় ফিরে আসার পর লীগ শুরু হল। যতদূর মনে পড়ছে, সেবার লীগে ইস্টার্ন রেলওয়ের হয়ে ১৪টা গোল করেছিলাম। তবে যতই লীগ-ম্যাচে গোল করি না কেন, মাথায় ঘুরছিল মেলবোর্ন অলিম্পিক।

লীগ শেষ হবার পর ভারতীয় দলের ট্রায়াল শুরু হল ইস্টবেঙ্গল মাঠে। ট্রায়াল দেখার জন্য কিছু উৎসাহী দর্শক প্রথম দিন থেকেই হাজির ছিলেন। কিন্তু ঐ উৎসাহী ফুটবল-প্রেমিকদের পক্ষেও ট্রায়ালে ডাক পাওয়া সব খেলোয়াড়দের চিনে ওঠা সম্ভব ছিল না। কারণ, কোচ রহিম সাহেবের অনুরোধে বেশ কিছু উদীয়মান খেলোয়াড়কে নেওয়া হয়েছিল।

ভারতীয় দলের রাশিয়া সফরের সময়েই রহিম সাহেব বুঝেছিলেন, বয়স্ক ফুটবলারদের দিয়ে আর আন্তর্জাতিক ফুটবলে সুফল পাওয়া যাবে না। উনিশশো বাহান্ন সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের ভারতীয় ফুটবল দলের একজনকেও ডাকা হল না। বাদ পড়লেন তখনকার বাঘা-বাঘা সব খেলোয়াড়—শৈলেন মান্না, আমেদ খান, বেঙ্কটেশ, ধনরাজ, মেওয়ালাল, রামন, সাত্তার প্রমুখ। এতজন দিকপাল ফুটবলারকে একসঙ্গে বাদ দেওয়ায় কঠোর সমালোচনা হল। কিন্তু রহিম সাহেব মনে-মনে জানতেন, যতই সমালোচনা হোক, ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির জন্য তরুণদের তুলে আনতেই হবে। আধুনিক ফুটবলের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে, বয়স্ক ফুটবলারদের সরিয়ে দিতেই হবে। কিট্টু, সালাম, লতিফ, কেম্পিয়া, থঙ্গরাজ, নিখিল নন্দী এবং আমি আগেই ভারতীয় দলে ঢোকার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম। নতুনদের মধ্যে এলেন বলরাম, কানন, দামোদরণ, নারায়ণ, জুলফিকার, ইউসুফ খাঁ, রহমতুল্লা, রাম বাহাদুর আর চুনী গোস্বামী। সমর ব্যানার্জি (বদ্রু), নুর এবং গোলকীপার নারায়ণও ডাক পেলেন।

প্রথম দিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। ট্রায়ালে হাজির ছিলাম মাত্র তিনজন—আমি, কেম্পিয়া আর নিখিল নন্দী। রহিম সাহেব বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তিনজনকে নিয়েই কাজ শুরু করে দিলেন। এই প্রথম কোচ হিসাবে তাঁকে দেখলাম। বুঝলাম, মানুষটি শক্ত ধাঁচের, যা করেন ভেবেচিন্তেই করেন।

তিন-চার দিনের মধ্যেই অন্য সকলে এসে

গেলেন। স্থানীয় ফুটবলাররা বাড়ি থেকেই রোজ আসতেন। বাইরের খেলোয়াড়রা সেই পরিচিত ব্রডওয়ে হোটেলেই রইলেন। আমি বাংলার বাইরে বড় হয়েছি, হিন্দি ভালই জানতাম। তাই বাইরের ফুটবলারদের সঙ্গে খুব সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যেত। সবচেয়ে মজাদার হায়দারবাদের নুর। অল্পবয়সী নুর খুব মজা করতেন। একদিন লতিফের কোটের পিছনে চক দিয়ে আলতো করে লিখে দিলেন, 'প্রাইম মিনিস্টার অব ইণ্ডিয়া'! সবাই হেসে খুন, বেচারি লতিফ কিছু বুঝতে না পেরেই হাসছিলেন। পরে অবশ্য বুঝলেন, এক্ষেত্রে অন্তত তাঁর হাসা উচিত হয়নি! নুরকে তাড়া করলেন, কিন্তু ততক্ষণে নুর উধাও।

টানা পাঁচ সপ্তাহ ট্রেনিং চলল। এই প্রথম আমরা জানলাম, থিওরিটিক্যাল ক্লাস কাকে বলে। প্রত্যেককেই ক্লাসে নোট নিতে হত, রহিম সাহেব ঠিক স্কুলের মতো পড়া ধরতেন। তিনি অবশ্য পেশায় সত্যিই স্কুল-শিক্ষক ছিলেন।

উনিশশো চুয়ান্নর বিশ্বকাপে পুসকাসের হাঙ্গারি ফাইনালে দুর্ভাগ্যবশত পরাজিত হলেও গোটা ফুটবল-দুনিয়াকে চমৎকৃত করেছিল। সেই ফুটবলের ধারায় অনুপ্রাণিত রহিম সাহেব ভারতীয় দলেও তিন-ব্যাক-প্রথা আনতে চাইলেন। এই প্রথায় বিশেষ বিশেষ খেলোয়াড়কে রোখার দায়িত্ব বিশেষ খেলোয়াড়কে দেওয়া হয়। ম্যান-টু-ম্যান মার্কিং-এর যুগ এসে গেল।

ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে রহিম সাহেব দারুণ আন্তরিক ছিলেন। কেউ ফাঁকি দিলে রেগে যেতেন। তবে শুধু রাগ নয়, ভালবাসতেও দেখেছি। সব সময়েই তাঁর রাগের সঙ্গে স্নেহ মিশে থাকত। একদিন ইউসুফ খাঁ ট্র্যাপিংয়ে ভুল করায় রহিম সাহেব ছুটে এসে লাথি মারলেন! পরক্ষণেই ইউসুফকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন।

ভাবতে পারো, অন্য কোনো কোচ কোনো খেলোয়াড়কে লাথি মারলে কী কাণ্ড ঘটত? কিন্তু রহিম সাহেবকে কেউ কখনও ভুল বোঝেনি। যদি কখনো ইউসুফ খাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, একবার রহিম সাহেবের কথা জিজ্ঞেস কোরো। দেখবে, কৃতজ্ঞতায়-শ্রদ্ধায় ইউসুফের কাঁচা-পাকা চুলমেশানো মাথা নুয়ে এসেছে, হয়তো দু-এক ফোঁটা চোখের জলও পড়বে। কোনো সন্দেহ নেই, আমার দেখা শ্রেষ্ঠ কোচ রহিম সাহেব। এই ছোট্ট চেহারার মানুষটির হৃদয়ও যে কত বড় ছিল, সেই গল্প তোমাদের পরে শোনাব। (ক্রমশ)

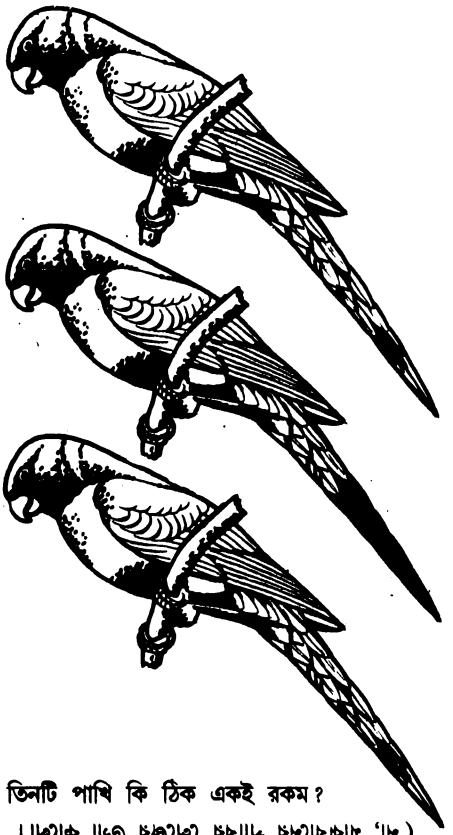

ছবির মজা

তিনটি পাখি কি ঠিক একই রকম?

(উ: প্রথমটির সঙ্গে তৃতীয়টির মিল নেই।)

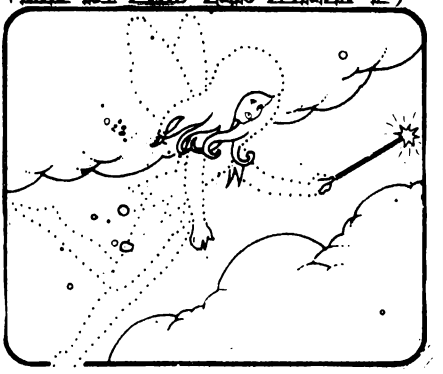

ফুটাকগুলো পরপর জুড়ে দাও, তারপর রঙ-পেনসিল বুলিয়ে রঙিন করো এই ছোট্ট পরীকে।

ষড়ানন গড়াই

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গড়াই-বাড়ির ষড়াননের
গড়ন কিছু বাড়ন্ত,
তাই বলে তার
নাই কোনো হামবড়াই,

বয়স যখন মাত্র বছর আড়াই,
চড়াত করে পাঁচ হাত হল খাড়াই!
কড়াইডাঙায় বলদ-লাঙল ছাড়াই
চাষ করে সে দুধ খেয়ে এক কড়াই।

ফাওড়া দিয়ে কুপিয়ে মাটি মাড়ায়
জোড়-পায়ে সে; রোয়ায়-কাটায়-ঝাড়ায়
লোক ডাকে না, আড়তঘরের আড়ায়
ঠেকে ফসল। বাঘের সঙ্গে লড়াই

করার বড়ই সাধ মনে, তাই চরায়
বনের ধারে মোষগোরু; বাঘ ভরায়
ভিড়তে দেখে দেহের বহর, ত্বরায়
ঘাবড়ে পালায়, দেয় না তারে দেখাই

রাত-দুপুরে ডাকলে হুতুম প্যাঁচায়
আঁতকে উঠে গড়াই কিন্তু চ্যাঁচায়
আঁকড়ে ধরে মা'কে কিংবা 'বেচা'য়,
দশটা ষাঁড়ের ডাক ডাকে সে একাই।

পাড়ার লোকের হলেও ভীতির পাত্র
বয়স তো তার আড়াই বছর মাত্র,
ওই বয়সের শিশু দিবসরাত্র
চেঁচিয়ে থাকে এমনি সচরাচর।

দৈবেতে তার লম্বাচওড়া গড়ন
জোয়ান লোকের মতন ধরন-ধারণ,
তাই বলে তার ভয় পাওয়া কি বারণ?
বয়স তো তার কেবল আড়াই বছর।

ছবি দেবাশিস দেব

রোভার্সের রয়

অস্ট্রেলিয়ার আন্তজাতিক টুর্নামেন্টে খেলতে এসেছে মেলচেস্টার রোভার্স। কিন্তু প্রথম দিনের প্র্যাকটিস-খেলাতেই স্থানীয় দল জ্যাকসন জ্যাভেলিনসের কাছে এক গোলে হারছে তারা ...

রয় কিন্তু তৈরি ছিল···
গোল শোধ হয়েছে!
মার্ভিনেরই পাওনা ছিল এটা!
মনে রেখো, শক্ত জমি বলে বল এখানে বেশি লাফায়!
তাই দেখছি!
রোভার্স এবারে মন দিয়ে খেলছে···
এই নাও!
রানাসকে কড়া পাহারায় রেখেছে ডানকান ম্যাকে!
আর গোল হবার আগেই খেলা শেষ!
টুর্নামেন্ট জিততে হলে আরও ভাল খেলতে হবে!
নিশ্চয় খেলব!
রোভার্সের খেলোয়াড়রা বাসে উঠছে···
সমুদ্রের ধারে নিয়ে চলো!
যাক, একটু বেড়ানো যাবে!
রয়ের মতলব কিন্তু আলাদা···
ধরো, এই হচ্ছে গোলপোস্ট!
আরে, এখানেও প্র্যাকটিস?
প্র্যাকটিস ছাড়া টুর্নামেন্ট জেতা যায় না!
বল পেয়েছি!
নোয়েল বল নিয়ে এগোচ্ছে!
এই রে, বালির দুর্গ ভাঙবে!
কিচ্ছু ভয় নেই খোকাবাবুরা!
কিন্তু সমুদ্রের জলে ওটা কী?
রোভার্সের একজনের বিপদ ঘনিয়ে আসছে!
এর পরে আগামী সংখ্যায়

যাক, কুট্টস নয়!
কিন্তু কুট্টস কোথায়?
পাজি, ইঁদুর, মেরে শেষ করব!
আরে!
শেষ করব!
খবর্দার!
কুট্টস, ভয় নেই! আমি এসেছি!
গেলুম!
সত্যি ইঁদুর!
এইবার!
এসো বাছাধন···
মানে···আমি ঠিক···ইয়ে···
আমাকে মারা? মজা দেখাচ্ছি!
ভুল হয়ে গিয়েছিল!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

১		২	৩	■	৪	
	■	৫				■
৬		■		■		■
	■	■	■	■	■	৭
■	৮	■	৯	■	১০	
■	১১			১২	■	
১৩		■	১৪			

সংকেত: পাশাপাশি: (১) অসমসাহসী। (৩) বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একজন। (৫)জলজ ফল। (৬) কোকিলের ডাক। (১০)গাছ। (১১) বিশেষ ধরনের কণ্ঠহার। (১৩) জলচর পাখিবিশেষ। (১৪) ফুলের মধু।

উপর-নীচ: (১) শিকারি কুকুর। (২) এমন পাত্র যাতে তরল পদার্থ রাখা হয়। (৩) বিশ্ববিখ্যাত খেলা। (৪) ক্ষতিকারক পতঙ্গ। (৭) যে-পাথর রত্ন পালিশের কাজে লাগে। (৮) অলংকার-বিশেষ। (৯) মৃত্যুকালীন। (১২) ঝাড়ুদার পাখি।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ম	ক্ষি	কা	■	কে	শ	র
ঞ্জী	■	ছে	দ	ক	■	ক্তো
র	■	■	গু	■	■	ঙ্গ
■	ক	র্ম	কা	র	ক	■
ঢো	ল	■	র	■	বি	ধু
■	র	■	ণ্য	■	য়া	■
জী	ব	ক	■	লা	ল	ন

ধাঁধা

গেল এবং আর যা জানা গেল তা রীতিমতো একটি ধাঁধা।

ছোট্‌কা একটা কুড়ি টাকার নোট দেখাল। দিব্যি লালচে রঙের ঝকঝকে নোট। কিন্তু নোটটা নাকি জাল। আর এই জাল নোটকে কেন্দ্র করেই এবারের ধাঁধার আরম্ভ।

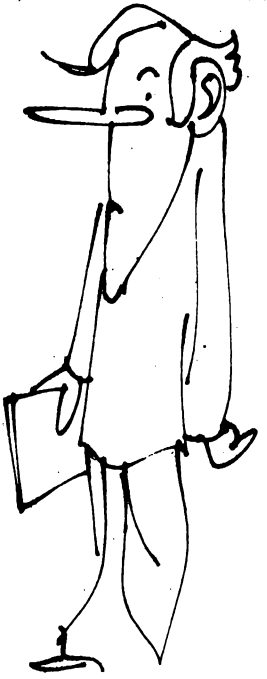

প্রথম ধাঁধা।। দুপুর বেলা অপরূপা স্টোর্সে এসেছিল একটি খদ্দের। সে একটা অ্যালবাম কেনে। দশ টাকা দাম লোকটিকে দেখেছি। অপরূপা স্টোর্সের কর্মচারী। কিন্তু ছোট্‌কার কাছে কেন এসেছিলেন জানি না। বিকেলে একবার ঘুরে গেছেন, ছোট্‌কা তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। আবার এলেন সন্ধে পার করে। ছোট্‌কার সঙ্গে কথা বলে কিছুক্ষণ আগে নেমে গেলেন।

খাবার টেবিলে ব্যাপারটা বোধগম্য হল। তাই বা বলি কী করে। বরং বলা যায়, লোকটির আসার কারণ জানা

অ্যালবামটার, লোকটি দেয় কুড়ি টাকার একটি নোট।

অপরূপা স্টোর্সের কর্মচারী মনোজবাবুর কাছে খুচরো ছিল না, পাশের আনন্দ ভাণ্ডার থেকে তিনি কুড়ি টাকার নোটটি ভাঙিয়ে দুটো দশ টাকার নোট করে আনেন। তার একটি ক্যাশে রেখে দেন অ্যালবামের দাম হিসেবে, অন্যটি লোকটিকে ফেরত হিসেবে দেন। লোকটি অ্যালবাম আর দশ টাকার নোট নিয়ে দোকান ছেড়ে চলে যায়।

আধ ঘণ্টাটাক বাদে আনন্দ ভাণ্ডারের মালিক হন্তদন্ত হয়ে এসে মনোজবাবুকে বলে যে, কুড়ি টাকার নোটটি জাল। হতভম্ব মনোজবাবু কী আর করবেন, জাল নোটটি নিয়ে আনন্দ ভাণ্ডারের মালিকের হাতে নতুন করে কুড়ি টাকা গুঁজে দেন। দিতে হবেই, কেননা, আনন্দ ভাণ্ডারের মালিকের আর দোষ কী।

যাই হোক, মনোজবাবু পড়েছেন ফাঁপরে। তিনি বুঝতে পারছেন না, ঠিক কত টাকা লোকসান হল তাঁর।

অ্যালবামটির কেনা-দাম অবশ্য পাঁচ টাকা। দশ টাকায় বিক্রি হয়। কিন্তু একটি জাল নোটের বদলে কড়কড়ে কুড়ি টাকা দিলেন আনন্দ ভাণ্ডারকে, খদ্দেরকে দিলেন দশ টাকা আর অ্যালবাম। অচেনা খদ্দের, ধরার কোনও পথ নেই।

মনোজবাবুর সত্যি-সত্যি কত টাকা লোকসান হল, বলতে পারো?

দ্বিতীয় ধাঁধা।। দু-রকম মুদ্রায় পঁয়ত্রিশ পয়সা রয়েছে আমার কাছে। একটি মুদ্রা সিকি নয়। মুদ্রা দুটি কী-কী বলতে পারো?

তৃতীয় ধাঁধা।। খুব তাড়াতাড়ি সংখ্যায় লেখো তো— এগারো হাজার এগারো শো এগারো।

গতবারের উত্তর।। (১) দেশলাই কাঠিটাই আগে জ্বালতে হবে। (২)৪ডিসেম্বর ১৯৮১, শুক্রবার। (৩) সব মাসেই তো ২৮ দিন রয়েছে, তাই না? (৪) গোলোকধাম।

—সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

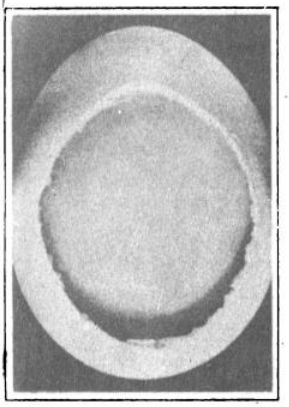

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল মোটরগাড়ির হেডলাইটের ফোটো

ফোটো তপন দাশ

মজার খেলা

নীচের ছবির মতো একটি তারা এঁকে নাও কাগজের ওপর এবং 'ক' থেকে 'ঙ' পর্যন্ত চিহ্ন দিয়ে নাও। আর যোগাড় করো নটি পয়সা এবং কোনও বন্ধু, যাকে খেলতে বলবে খেলাটা।

খেলাটা হল, যে-কোনো একটা চিহ্ন-দেওয়া জায়গা থেকে শুরু করে পরের চিহ্ন-দেওয়া জায়গা ছেড়ে তার

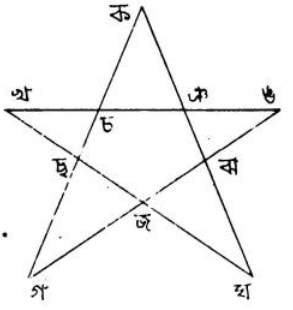

পরের চিহ্ন-দেওয়া জায়গায় একটা করে পয়সা বসাতে হবে। এইভাবে নটা পয়সা বিভিন্ন জায়গায় বসবে, একটা শুধু খালি থাকবে।

মজা হল, শুনতে সহজ হলেও কায়দা না-জানা থাকলে কেউই পারবে না শর্ত মেনে নটা পয়সা বসাতে।

সুতরাং কায়দাটা মন দিয়ে লিখে নাও। যে-জায়গা থেকে শুরু করো না কেন, পরের বারের পয়সা যেন সে-জায়গাতেই বসে, সেই হিসেব করে পয়সা বসিয়ে যেতে হবে, এভাবেই পুরো নটা ঘর ভর্তি করা যাবে।

যেমন ধরো, 'ক' থেকে শুরু করে 'ঞ' ডিঙিয়ে পয়সাটা 'ঝ'-তে বসালে। এবার 'ছ' থেকে শুরু করে 'চ' ডিঙিয়ে 'ক'-তে বসাতে হবে দ্বিতীয় পয়সা। তৃতীয় পয়সা বসবে 'ছ'-তে, সুতরাং শুরু হবে 'ঘ' থেকে। এইভাবে যে-চিহ্ন থেকে শুরু, পরের বার সেই সেই চিহ্নে এনে পয়সা বসিয়ে যাও, তাহলে দেখবে দশটার মধ্যে নটা ঘরে পয়সা বসবে, একটা ঘর খালি থাকবে। এবং শর্তও মেনে চলা হবে।

—মজারু

হাসিখুশি

মা রমেশকে ধমক দিলেন,"তুমি অতটুকু ছোটভাইকে পেটে লাথি মারলে কেন?"

রমেশ নির্বিকারভাবে বলল, "কী করব, আমি তো পেটে লাথি মারতে চাইনি, আমি পিঠে মারতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ও চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, তাই পেটেই মারতে হল।"

শুধু অলস ছেলেরাই পারে ভাল ছেলে হতে। কারণ দুষ্টু ছেলে হতে গেলে বেশ পরিশ্রম করতে হয়।

জজ সাহেব আসামীকে মামলার শেষে প্রশ্ন করলেন, "তুমি দোষী না নির্দোষ?"

আসামী বাঁকা হাসি হেসে বলল, "তা আমি বলব কেন? সেজন্যে তো আপনাকে মাইনে দিয়ে ওখানে বসানো হয়েছে, আপনি নিজেই বলুন।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

উত্তর বটে

প্রঃ কৃমির শিকার করার সহজ উপায় কী?

উঃ একটা সরু খাল কেটে কুমিরকে আনো তারপর সবাই মিলে পিটিয়ে মারো।

প্রঃ দুজন হার্টের রুগি দেখা হলে নিজেদের মধ্যে তারা কী কথা বলে বলুন তো?

উঃ হার্ট-টু-হার্ট টক।

প্রঃ একটা গল্প লিখব ভাবছি, কী করে শুরু করা যায় বলুন তো?

উঃ প্রথম থেকে।

প্রঃ এই হাসপাতালে কোনো বড় মানুষ জন্মেছিলেন কি?

উঃ না, এখানে শুধু বাচ্চারা জন্মায়।

—সুসেন

সোনাঝরা দিনের মধুর আবেশ
চিরকাল রাখে তার সুরভিত রেশ

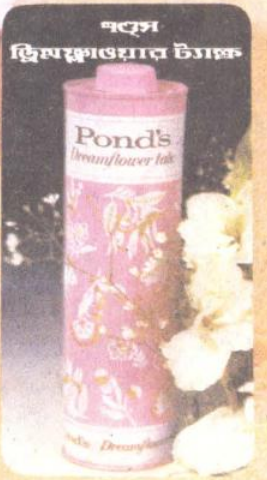

যে সৌরভ আপনার মন মাতায়

অকাল নিবাস-গুরুধাম
শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থাগার

HTM-PIL-2133

ছবি এঁকেছে সুনন্দ পাল (বয়স-৫)

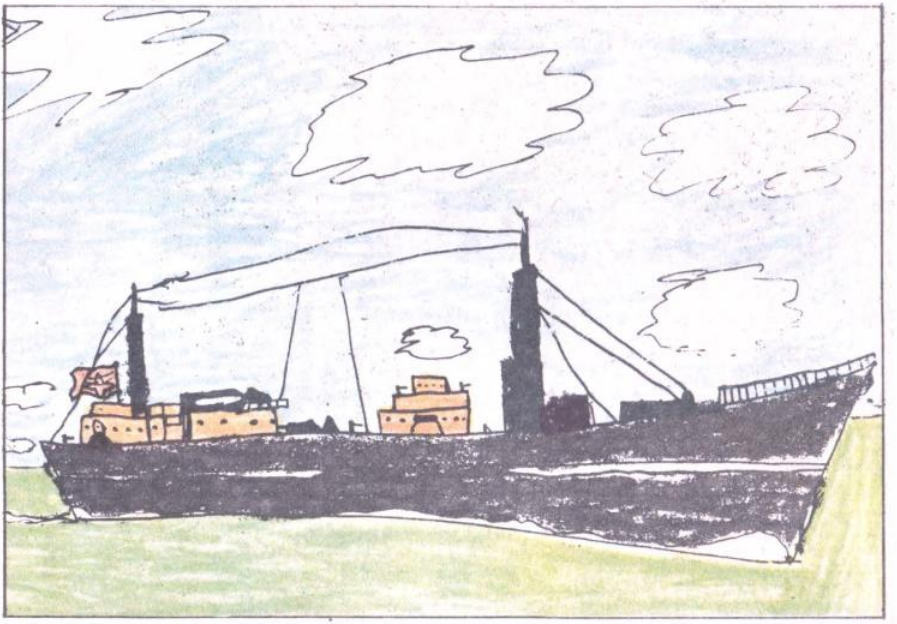

ছবি এঁকেছে পিনাকী ঘোষ (বয়স-৬)

হিংসা

আমি এখানে যে গল্পটি লিখছি, সেটি একদম সত্য ঘটনা। এই ঘটনাটি আমার চোখের সামনে ঘটেছে।

কিছুদিন আগে থেকে আমাদের স্কুলের গেটের কাছে একটি ঘুগনিওয়ালা বসে, এই ঘুগনিওয়ালাটি কেটু বুড়োগোছের। সে রোজই আমাদের স্কুলে ঘুগনি বেচতে আসে। একদিন আর-একটি ঘুগনিওয়ালা এসে আমাদের স্কুলের গেটের কাছে ঘুগনি বেচতে বসল। সে এখন রোজই ঘুগনি বেচে। তার ঘুগনি একটু পাতলা হয়। তবুও তার থেকে অনেকেই ঘুগনি কেনে। তার ঘুগনি পাতলা বলে অপর ঘুগনিওয়ালাটি তাকে নানাভাবে খোঁচা দেয়। তবু সে চুপ করে থাকে। অপর ঘুগনিওয়ালাটি তার ঘুগনির হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে নানারকম মন্তব্য করে। আমরা যার ঘুগনি পাতলা, তাকে বলি, "তুমি তোমার ঘুগনি বেচো, ও ওর ঘুগনি বেচুক।"

আমি মনে মনে ভাবি যে, অপর ঘুগনিওয়ালাটি তার বিক্রি কমে যাবে বলে অন্য ঘুগনিওয়ালাটিকে এইরকম করে। আমি ভাবি হিংসা এমনই বস্তু। এই হিংসা দেখে আমার সেরিবা ও সেরিবাচোর কথা মনে পড়ে।

দীপায়ন গঙ্গোপাধ্যায় (বয়স-১২)

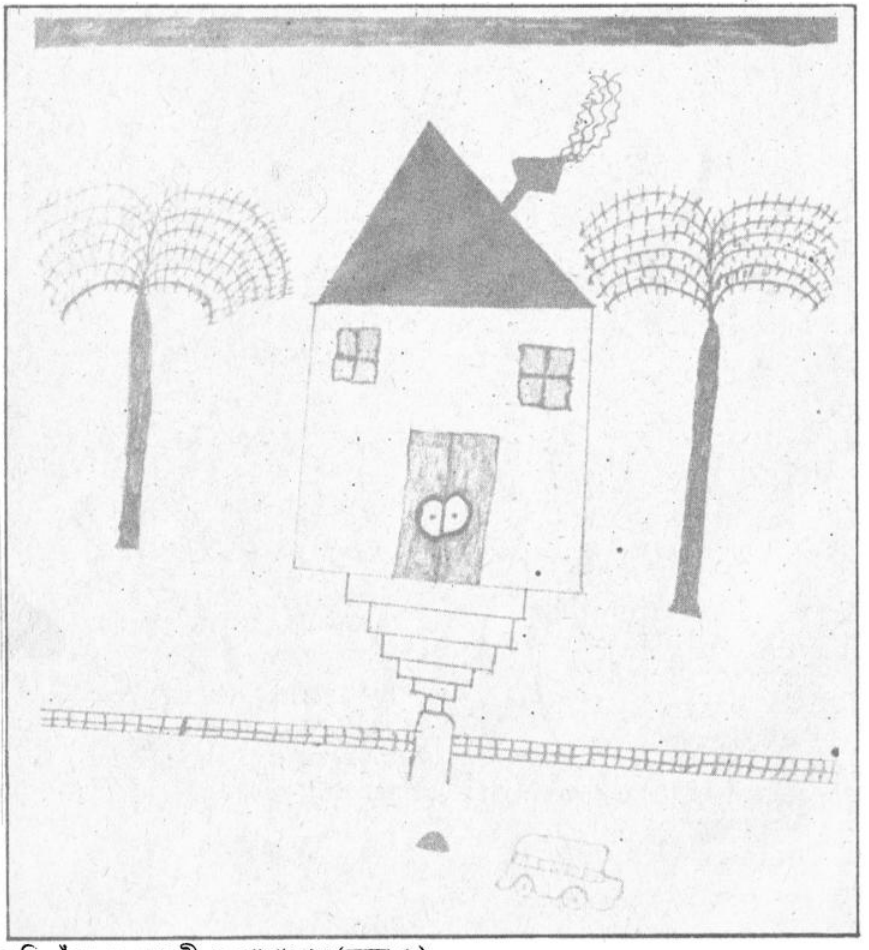

ছবি এঁকেছে মাধবী মুখোপাধ্যায় (বয়স-৭)

জুঁইফুল

সুনীল বসু

একদিন আমি টেনে ছিঁড়লুম
রেগেমেগে গিয়ে রাত্রির ঘুম
দু'চোখের পাতা এক না-করেই
বিছানার জলে ডুবে না-মরেই।

ধরে ফেললুম পাঁচ বছরের
রোগা মেয়েটিকে!
ঝাপসা ও ফিকে
তখনো রয়েছে পৃথিবী জড়িয়ে
আবছায়া ভোর।

তেড়ে বললুম, "নাম বল্ তোর!
কেন রোজ তুই
পটপট করে ছিঁড়িস্ রে এত
ফুটফুটে জুঁই?
করিস রে কেন এত ফুল চুরি?
নাম বল তোর!"

তখন মেয়েটি পাখির মতন
গলায় বলল,
"নাম তো আমার ফুল—ফুলঝুরি!"

এ-কথা শুনেই বুকে টেনে নিয়ে
বললুম ওকে
চেয়ে থেকে ওর কালো দু'টি চোখে
হেসে হাত ধরে,
"আসিস্, আসিস্ রোজ তুই ভোরে—
নিস ফুল তুই,
কেননা নিজেই তুই তো একটা
ফুটফুটে জুঁই!"

ছবি অনুপ রায়

ক্যাম্পার সঙ্গে
আমরা মাতি রঙ্গে
স্বাদে ও আনন্দে!

ক্যাম্পা অরেঞ্জ ফ্লেবার- স্বাদে ও আনন্দে!

OBM/5361

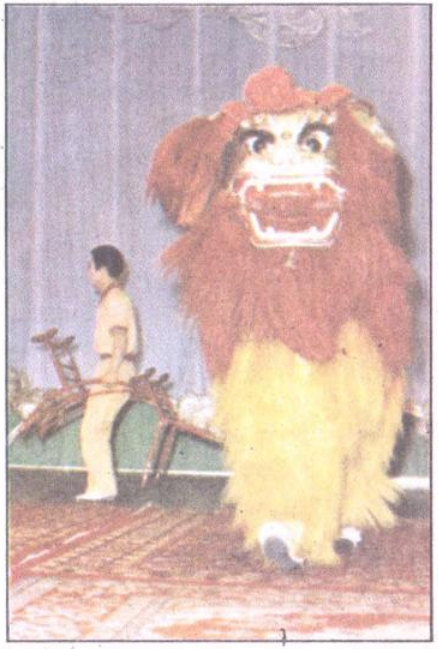

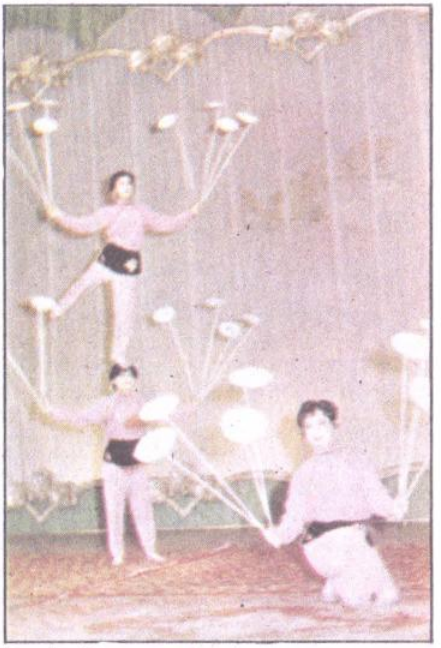

ফোটো তপন দাস

(পাতা ওলটালেই চীনা অ্যাক্রোব্যাটদের খেলার খবর)

চীনা অ্যাক্রোব্যাট

অহিভূষণ মালিক

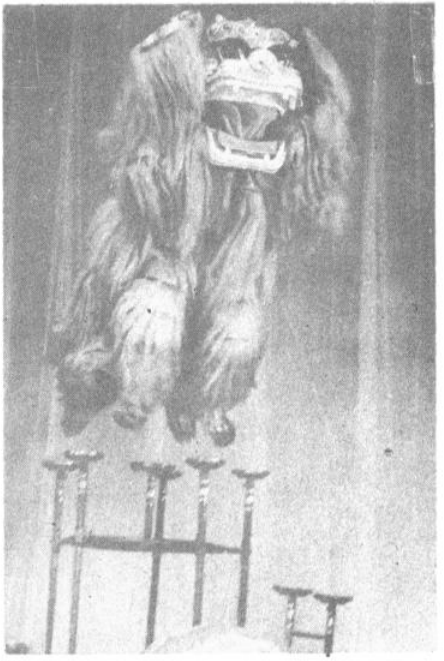

সিংহের খেলা

চেয়ার নিয়ে ব্যালান্স

তোমরা সবাই সার্কাস দেখেছ। এই তো, গেল শীতে কত বড়-বড় সার্কাস হয়ে গেল কলকাতায়। সার্কাসে নানা রকম জিমন্যাসটিকের খেলা দেখানো হয়, কার না ভাল লাগে ঐ সব খেলা, কী বাহাদুরিটাই না দেখায় খেলোয়াড়রা। শীত শেষ হতে-না-হতেই এ-দেশে এল চীন থেকে, ভারত সরকারের আমন্ত্রণে, উহান অ্যাক্রোব্যাটিক ট্রুপ। কলকাতা খেলা দেখালেন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে। সার্কাসের মতো এঁদের সঙ্গে জন্তু-জানোয়ার আসেনি, মানুষেরাই সিংহের পোশাক পরে, বনমানুষের পোশাক পরে, ড্রাগনের পোশাক পরে দিব্যি অভিনয় করে গেলেন। চীনারা দারুণ ভাল শিল্পী, ঐ সব পোশাক জীবন্ত জন্তু-জানোয়ারের মতো হুবহু-তৈরি না করে তাঁদের প্রথাগত কলাকৌশলে বাহারি করেছেন, ব্যাপারটা যেন আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। দুটি বড়-বড সিংহ এল হেলেদুলে। পোশাকের ভেতর কিন্তু এক সঙ্গে দুটি করে মানুষ। পিছনের একপা তুলে মাথা চুলকে নিল, দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে গা চুলকে সিংহের সে কী চোখ পিটপিটুনি। তারপর বল নিয়ে খেলা, চার পায়ে ব্যালান্সের খেলা, আরও কত কী দেখাল তারা। শুধু ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাই নয়, বড়রাও সিংহদের, আর সেইসঙ্গে একগাদা বনমানুষের কাণ্ডকারখানা দেখে আনন্দে হাততালি না দিয়ে পারেনি।

আমাদের দেশেও বড়-বড় অ্যাক্রোব্যাট দেখা যায়, কিন্তু তাঁদের কদর কতটুকুই বা! যত হৈচৈ হয় ফুটবল-খেলোয়াড় আর ক্রিকেট-খেলোয়াড়দের নিয়ে। চীনদেশে প্রজাতন্ত্রী সরকার গড়ে ওঠার আগে যাঁরা জিমন্যাসটিক দেখাতেন, তাঁদের বাহাদুরি দিলেও, সমাজে সম্মান ছিল না। কিন্তু বর্তমানে সেখানে অ্যাক্রোব্যাট বা জিমন্যাস্টদের দারুণ খাতির। মল্লক্রীড়ার, চীনা ভাষায় যাকে বলে জিজা, উন্নতির জন্যে চীন সরকার প্রচুর অর্থব্যয় করছেন, ছেলেমেয়েদের যখন পাঁচ-ছ বছর মাত্র বয়স থাকে তখন থেকেই খেলা শেখার ব্যবস্থা হয়েছে। এই উহান অ্যাক্রোব্যাটিক ট্রুপ-এ আছেন ২০০ জন খেলোয়াড়, তার মধ্যে ভারতে এসেছেন ৫১ জন। খেলা দেখালেন ১৩ জন মেয়ে

আর ১৮ জন পুরুষ। জিজা সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা চলেছে চীনে। প্রাচীন প্রথাগত খেলাও যেমন শেখানো হচ্ছে, তেমনি নতুন খেলাও উদ্ভাবন করা হচ্ছে ক্রমাগত। নতুন খেলার মধ্যে পাশ্চাত্ত্যের জিমন্যাসটিকের অবশ্যই অনেক কৌশল এসে পড়েছে। তবে উহান খেলোয়াড় যা-ই দেখান, একেবারে নিখুঁত।

দলে ছিল তোমাদের বয়সী একটি ছেলে আর একটি মেয়ে, ছেলেটির বয়স ১১ আর মেয়েটির ১২। ছেলেটি যেমন ছটফটে তেমনই ওস্তাদ আর মেয়েটি বড়দের সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিয়ে গেল ব্যালান্সের নানান খেলায়।

একটার ওপর একটা করে ১২টি চেয়ার, প্রত্যেকটি চেয়ারের শুধু দু পায়ায় ভর আর চেয়ারের হাতলের ওপর 'পীকক' অবস্থায় আছে পরপর মেয়েরা, একেবারে মাথার ওপর ঐ ছোট্ট মেয়েটা। কী অসাধারণ তার সাহস আর বাহাদুরি। না দেখলে বিশ্বাস হবে না। এক পালোয়ান গোছের পুরুষ একটা লম্বা বাঁশ সটান দাঁড় করিয়ে রাখল তার কাঁধের ওপর, একজন পুরুষ খেলোয়াড় দৌড়ে এসে তরতরিয়ে উঠে পড়ল ঐ বাঁশের ডগায়, যেমনভাবে বানররা গাছে চড়ে; তারপর অপর এক পালোয়ানের ঘাড়ে দাঁড় করানো অন্য বাঁশে মারল সে লাফ, আবার এ-বাঁশে লাফ—এইভাবে চলল তার লাফালাফি কিছুক্ষণ, সে কী কাণ্ড। পালোয়ানদের ঘাড়ের বাঁশ একটুও বেসামাল হচ্ছে না। শুধুই কি পুরুষেরা, এক মহিলাও ঐ পালোয়ানদের মতন ব্যালান্স করে ঘাড়ে দাঁড় করালেন এক মস্ত ইস্পাতের ডাণ্ডা, তার ডগায় দোলনা খাটিয়ে খেলা দেখিয়ে গেল অন্য একটি মেয়ে। ঐ রকম, সী-স খেলা, সাইকেলের খেলা, রণপা পরে ডিগবাজি খাওয়া, ট্রাপিজের খেলা একটার পর একটা করে দু'ঘণ্টা ধরে দেখিয়ে গেলেন উহান শিল্পীরা। জোকাররা তাঁদের সাজপোশাকে নয়, কীর্তিকলাপ আর অভিনয়ের গুণে দিব্যি হাসিয়ে গেলেন দর্শকদের।

এ-দেশের কেউ কখনও এমন খেলা দেখাননি বললে নিশ্চয় আমাদের খেলোয়াড়দের ছোট করা হবে। ভারতবর্ষেও বড়-বড় ওস্তাদ আছেন, কিন্তু উহানদের কাছে অনেক-কিছুই শেখার আছে। কত রঙবেরঙের পোশাক আর কী শৃঙ্খলা! পুরো দলটি যেন একটি মাত্র যন্ত্র, বিকল না হয়ে পরপর কাজ করে গেল তার একেকটা অংশ। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে আছে পরিচ্ছন্ন শিল্পরুচি। ফোটো অলক মিত্র

শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে খেলা

মানুষী ভিতের উপরে মানুষী স্তম্ভ

তিন 'বড়'র কে দড়

বজ্রসেন

"জানেন, আমি আর বিদেশ কালই মোহনবাগান ছেড়ে চলে যেতে পারি।"

বলাই বাহুল্য, কথাগুলো মানসের। মার্চের ৯ তারিখে। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণে একদিকে অস্থায়ী আই· এফ· এ· অফিসে এবং অপর দিকে এ· আই· এফ· এফ· অফিসে তখন যথাক্রমে আন্তঃক্লাব ও আন্তঃরাজ্য ফুটবল ছাড়পত্র স্বাক্ষরের জমাট পালা একেবারে পুরোদমে চলছিল। গৌতম-সুব্রত-প্রসূন-মানস-বিদেশ এশিয়ান গেমস প্রস্তুতি শিবির সংক্রান্ত কাগজপত্রে সই করতে এ· আই· এফ· এফে এসেছিলেন। হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টিতে ওঁরা সকলেই আটকে যান। মানসকে কাছে পেয়ে গল্প করছিলাম।

ভেবেছিলাম, নেহাতই কথার কথা। মোহনবাগানের আটজন খেলোয়াড়ের ক্ষোভের যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল ঠিকই। কিন্তু গত কয়েক বছর একসঙ্গে মোহনবাগানে খেলে ওঁরা এমন একটা পরিবেশ ও মানসিকতা তৈরি করে নিয়েছিলেন যে অন্য কোথাও ওঁদের পক্ষে মানিয়ে নেওয়াটা একরকম অসম্ভব। যাই হোক, চার দিন পরে শেষ পর্যন্ত নিজ হাতে গড়া কাঁচা ঘর ছেড়ে মহামেডানের 'পাকা' বাসায় একই মুহূর্তে উড়ে গেল তিন পাখি——মানস, বিদেশ আর প্রসূন। দলবদলের বাজারে এত বড় ধাক্কা মোহনবাগান স্মরণকালে খায়নি। তিন স্টার, যাঁদের মধ্যে একজন ভারতের অধিনায়ক ও একজন দলের ভাবী অধিনায়ক, চলে গেলেন।

শুধু নিজেদের খেলোয়াড় ধরে রাখার ব্যাপারেই মোহনবাগান ব্যর্থ হয়নি। অন্যান্য ক্লাব থেকে যে-সব খেলোয়াড় এনেছে তার মধ্যেও কোনও সুপরিকল্পিত নীতির বালাই নেই। নতুন পুরনো মিলিয়ে এগারো জন ব্যাক মোহনবাগানে। ওদের দিয়েই একটা গোটা টীম বেশ ভালোভাবেই হয়ে যায়ঃ শ্যামল ব্যানার্জি, সঞ্জীব চৌধুরী, কম্পটন দত্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদীপ চৌধুরী, অশোক চক্রবর্তী, ছাড়া নতুন এসেছে ভারতীয় যুবদলের অধিনায়ক লেফট ব্যাক বিশ্বজিৎ বসু (এরিয়ান), তিন স্টপার —গৌতম ভট্টাচার্য (মফতলাল), সমর ভট্টাচার্য (ইস্টবেঙ্গল) ও সুদীপ চ্যাটার্জি (বি· এন· আর) এবং ইস্টবেঙ্গলের ১৯৮০-র অধিনায়ক সত্যজিৎ মিত্র। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সত্যজিৎকে কেন আনা হল, বোঝা গেল না।

মোহনবাগানের গোলকীপাররা অবশ্য কেউ জামা বদলাননি—শিবাজী, প্রতাপ, জগদীশ সকলেই আছেন। গৌতমের পাশে তরুণ সাহসী ও পরিশ্রমী লিঙ্কম্যান দীপক ব্যানার্জি খেলবেন। এরিয়ান থেকে এটি মোহনবাগানের অবশ্যই মূল্যবান সংগ্রহ। গৌতম সরকারের অনুপস্থিতিতে বা তাঁকে বিশ্রাম দেবেন সুযশ বেরা (রেলওয়েজ) অথবা হাবিব। হাবিবও সত্যজিতের মতো মোহনবাগানকে কতটা সাহায্য করতে পারবেন সেটা বলা শক্ত—মনে রাখতে হবে, ১৯৮১ হচ্ছে কলকাতায় হাবিবের ষোড়শ মরসুম।

মোহনবাগান ফরোয়ার্ডে পেয়েছে সুরজিৎ সেনগুপ্ত (মহামেডান) ছাড়াও উঠতি দুই স্ট্রাইকার বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য (এরিয়ান) ও অরূপ দাশকে (রেল)। সুরজিৎ ইদানীং অত্যন্ত আঘাতসচেতন, তা ছাড়া মোহনবাগানের হয়ে কোনো দিনই তাঁর খেলা খোলেনি। তবু সুরজিৎ সুরজিৎই। কখন কোনদিক দিয়ে যে কী করে বসেন, বলা শক্ত। বিশ্বজিৎ ও অরূপ গতবার লীগে ও ওড়িশায় সন্তোষ ট্রফিতে ভাল খেলেছিল। এই তিন নতুনের সঙ্গে 'ওল্ড ফেথফুল'রা—ফ্রান্সিস ডিসুজা, পায়াস, মিহির, উলাগানাথন, শ্যাম থাপা, কেষ্ট মিত্র আছেন। উলাগানাথন গত রোভার্স কাপে দু' দিকেই ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোল করেছিলেন।

ইস্টবেঙ্গল গত বছরই বেশ শক্তিশালী দল ছিল। এ-বছর ইস্টবেঙ্গলের শক্তি দ্বিগুণ বেড়েছে। দু'রকম দলবদলের পর ইস্টবেঙ্গলই এবার প্রশ্নাতীত ভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী দল। কেউ কেউ বলে থাকেন, গতবার ইস্টবেঙ্গল ভাঙা দল নিয়ে খেলেছে। ওটা একেবারেই বাজে কথা। যে দলে মজিদ বাসকার ও জামশিদ নাসিরি-র মতো খেলোয়াড় আছেন তাকে 'ভাঙা' বলা কি ঠিক? মজিদ ও জামশিদকে এবার মহামেডান ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। অবশ্য ওঁদের বেঁধে রাখবার জন্যে খাবাজিকেও রাখতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলে। সকল অর্থেই মজিদ ও জামশিদ

'মূল্যবান' খেলোয়াড়। ওঁরা ইস্টবেঙ্গলকে নিয়মিত সাহায্য করলেই রক্ষা নেই, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কয়েকজন কুশলী খেলোয়াড়। গোলে দিলীপ পালের সঙ্গে ওড়িশার গোপবন্ধু সাহা। বিশ্বজিৎ দাশ রাজস্থান থেকে পুরনো দলে ফিরে এসেছেন। উনি সম্ভবত দলের দু নম্বর গোলকীপার। ব্যাকে মহামেডানের প্রেমনাথ ফিলিপ, কর্ণাটকের ডোরাইস্বামী শেখরন, জর্জ টেলিগ্রাফের শঙ্কর সাহা ও বি·এন আর-এর অনুদেব । মনোরঞ্জন তো আছেনই—এবার তো দলের ক্যাপ্টেন। তা ছাড়া দলে আছেন দিলীপ পালিত, সুধীর কর্মকার ও ম্যাথিউজ।

কিন্তু ইস্টবেঙ্গল দলের আসল সমস্যা ছিল মধ্যমাঠে। গত কয়েক বছরই। এবারে সে-ফাঁক ভরাট করার প্রধান দায়িত্ব পড়েছে মহামেডানের গতবারের অধিনায়ক অমলরাজের উপর—যিনি গত বছর গৌতমের সঙ্গে প্রায় সমানে পাল্লা দিয়ে খেলে গেছেন। অমলরাজের পাশে খেলবেন গোয়ার জোসেফ ম্যাচাডো অথবা অন্ধ্রের ফরিদ। ধরেই নেওয়া যেতে পারে লিংকম্যান-সমস্যা কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গল এবার আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে।

ইস্টবেঙ্গলের অপেক্ষাকৃত দুর্বল জায়গা ফরোয়ার্ড লাইন। মজিদ-জামশিদ থাকা সত্ত্বেও। প্রতিষ্ঠিত বা পরীক্ষিত বিশুদ্ধ উইঙ্গার তেমন আর কেউ নেই। হরজিন্দার দেশে ফিরে গেছেন। দেবাশিসের পায়ে চোট না থাকলে সমস্যা হত না। অবশ্য কেরলের ফ্রান্সিসও এবার ইস্টবেঙ্গলে। তরুণ লেফট উইঙ্গার প্রীতি ঘোষাল এসেছেন রাজস্থান থেকে। আর আছেন এরিয়ানের দুই সেরা স্ট্রাইকার মতি সিং ও শঙ্কর অধিকারী। সোমনাথ ব্যানার্জিও থেকে গেছেন। তবু ইস্টবেঙ্গলই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর, বিশেষত মোহনবাগানের চেয়ে কাগজেকলমে অনেক বেশি শক্তিশালী। কারণ ইস্টবেঙ্গল এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতকে কোনও খেলোয়াড় দিচ্ছে না, সেদিক থেকে মোহনবাগান ও মহামেডান দু'দলেরই খুব অসুবিধা। মোহনবাগানের ১২ জন ও মহামেডানের ১০ জন খুব প্রয়োজনীয় খেলোয়াড়কে কতটা পাওয়া যাবে তা কেউই বলতে পারেন না। ইস্টবেঙ্গলের ও-সব চিন্তা নেই। তাই নাসির আমেদ, অমিত গুহ, সত্যজিৎ মিত্র, সমর ভট্টাচার্য, হাবিব, সুমিত বাগচি, কাজল

মানস (মহামেডানে গেলেন)

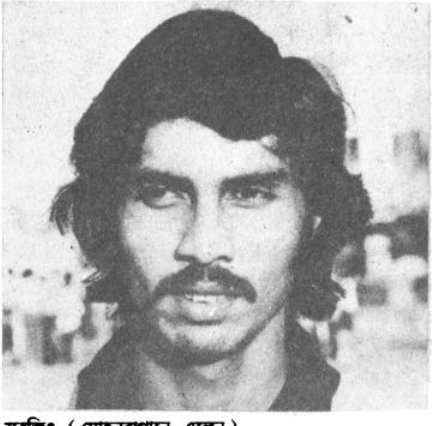

সুরজিৎ (মোহনবাগানে এলেন)

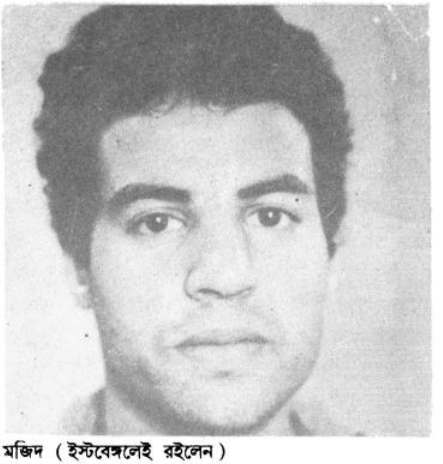

মজিদ (ইস্টবেঙ্গলেই রইলেন)

চ্যাটার্জি, নাজিব, হরজিন্দার, বিভাস সরকার, সুভাষ রায়, অবনী আইচ ও সাজ্জাদ, লতিফুদ্দিনকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গলের কোনও ক্ষোভ নেই।

প্রসূন-মানস-বিদেশকে পেয়ে মহামেডানের সমর্থকরা আহ্লাদে আটখানা। প্রেমনাথ ফিলিপ, অমলরাজ ও সুরজিতের 'শোক' তারা ভুলে গেছে। পূর্ণ শক্তি নিয়ে খেললে এটাই হওয়া উচিত মহামেডানের প্রথম দল—গোলে ভাস্কর গাঙ্গুলি, চার ব্যাক চিন্ময়, মইদুল, রমেন ও গৌরাঙ্গ, লিঙ্কম্যান দুই ব্যানার্জি প্রশান্ত ও প্রসূন এবং ফরোয়ার্ডে মানস-আকবর-সাব্বির-বিদেশ।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে মহামেডানই দ্বিতীয় শক্তিশালী টীম। তবে যা বলছিলাম। ক্যাম্পের ডাক পেলে উপরেরএগারো জনের ন'জনই খেলতে পারবে না। সে-চিন্তাও মহামেডান করে রেখেছে। তারা ইস্টবেঙ্গলের কাজল ও তপনকে নিয়েছে। আর নিয়েছে ডজনখানেক উঠতি প্রতিভাকে—রাজস্থান থেকে আখতার উদ্দিন আমেদ, শিবনাথ বাড়ুই ও কার্ত্তিক শেঠকে, এরিয়ান থেকে বলাই মুখার্জি, সমীর মুখার্জি, সমীরণ সাহা ও নির্মল চ্যাটার্জি, খিদিরপুর থেকে উত্তম মজুমদার, জর্জ টেলিগ্রাফ থেকে অলোক মুখার্জি ও অলোক চ্যাটার্জি। প্রতিষ্ঠিতরা ক্যাম্পে গেলেই এঁদের কপাল খুলবে, নতুবা কে কতটা সুযোগ পাবেন বলা শক্ত।

তবে দলের স্বার্থে মহামেডান ঝুঁকি না নিয়ে ঠিকই করেছে। এখন একটাই জিনিস দেখার —দুই বাম ব্যানার্জি লিঙ্কম্যান একসঙ্গে মানিয়েগুছিয়ে খেলতে পারেন কিনা।

অবশ্য এই মুহূর্ত অনেক-কিছুই অনিশ্চিত। কোনও দলেরই কোচ ঠিক হয়নি এখনও। মোহনবাগান ও মহামেডানের ক্যাপ্টেনের নামও জানা যায়নি। মোহনবাগান নাকি এখনও নরিন্দর গুরুং, সি· বি· থাপা ও এ· সি· সরকারের জন্যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাবার গেল

অশোক রায়

কে জানত, সমুদ্র পার হয়ে শেষ পর্যন্ত ভারত ডোবায় ডুববে! আমাদের বিশ্বাস ছিল, শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ ড্র রাখার পর অপেক্ষাকৃত দুর্বল নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারত সহজেই জিতবে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের ভরাডুবি হল ওখানে। নিউজিল্যাণ্ডের কাছে এই প্রথম সিরিজ সমর্পণে বাধ্য হল ভারত।

সিরিজের শুরু দুর্ভাগ্যকে সঙ্গে নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্নজয়ী ভারতীয় দলের তিন প্রধান বোলার ঘাড়ঝি, দোশি, যাদব আহত থাকায় ভারতীয় বোলিং দুর্বল হয়ে পড়ে গোড়াতেই। কীর্তি আজাদ, যোগরাজ সিং এবং নবাগত রবি শাস্ত্রীর একসঙ্গে অভিষেক হয় এই টেস্টে । টসজয়ী গাভাসকার নিউজিল্যাণ্ডকে ব্যাট করতে পাঠালেও জিওফ হাওয়ার্থের অপরাজিত ১৩৭ নিউজিল্যাণ্ডকে নিরাপদ ৩৭৫ রানে পৌঁছে দেয়। চোদ্দ ঘণ্টা প্লেনে কাটিয়ে নিউজিল্যাণ্ডে পা দিয়েই বোম্বাইয়ের ১৮ বছরের ন্যাটা স্পিনার রবি শাস্ত্রী জীবনের প্রথম টেস্টেই তিনটি উইকেট তুলে নেন চুয়াল্ল রানে। এরপর ভারতীয় ইনিংস একেবারে শুরু থেকেই নড়বড় করতে-করতে ভেঙে পড়ে ২২৩ রানে। সাহসী সন্দীপ পাটিলের চোখ-ধাঁধানো ৬৪ রানই ছিল এই ইনিংসের একমাত্র সম্পদ। মিডিয়াম পেস্যর ল্যান্স কেয়ারন্স্ পাঁচ ভারতীয়কে ক্রীজ থেকে সরিয়ে ফেলেন মাত্র ৩৩ রান খরচ করে।

১৫২ রানে এগিয়ে থাকার সুযোগ হাতে পেয়েও নিউজিল্যাণ্ড কিন্তু দ্বিতীয় দফায় মুড়িয়ে যায় মাত্র ১০০ রানে। চৌত্রিশ রানে চার উইকেট নিয়ে কপিল গতির ঝড় তোলেন। এবং ন' রানে তিন উইকেট নিয়ে পাতা ঝরানোর বাকি কাজটুকু করেন রবি শাস্ত্রী।

ভারতের জয় ছিল মাত্র ২৫৩ রান দূরে এবং হাতে ছিল অফুরন্ত সময়। তার উপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্ন জয়ের রামধনু তখনও চোখ থেকে মোছেনি। রেডিওর মধ্যেও যেন জয়ের গন্ধ আসছিল নাকে। কিন্তু একটা ব্যাটও চওড়া হয়ে

উইকেট আগলে রুখে দাঁড়াল না! মাত্র ১৯০ রানে আত্মসমর্পণ করল ভারত!

দ্বিতীয় টেস্ট, ক্রাইস্টচার্চ

ঘাউড়ি, দোশি দলে ফিরলেও ভারতের ভাগ্য কিন্তু এই টেস্টেও সুপ্রসন্ন হল না। মেঘলা-আকাশ মুখ গোমড়া করে থাকলেও টসে জিতে গাভাসকার-চৌহান প্রথম টেস্ট উইকেট জুটিতে ১১৪ রান তুলে বড় রানের ইনিংস গড়ার আশা জাগালেন। একসময় ভারত পৌঁছয় দু' উইকেটে দুশোতে। কিন্তু দ্বিতীয় নতুন বলে রিচার্ড হ্যাডলির আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় ভারত মাত্র ২৫৫ রানে। চৌহান-৭৮, গাভাসকার-৫৩ এবং বেংসরকার-৬১ ছাড়া বাকিরা আসা-যাওয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। আশ্চর্য মনে হলেও সত্যি শেষ আট জন ফুরিয়ে যান মাত্র ৫৫ রানে! নিউজিল্যাণ্ড বৃষ্টির বাধা এড়িয়ে ব্যাট করার সুযোগ পায় চতুর্থ দিনে। এবং 'তাড়াহুড়া' শব্দটিকে সযত্নে সরিয়ে রেখে ম্যাচ ড্র রাখার চেষ্টায় মন দেয়। ঢিমে তালে খেলেও জীবনের তৃতীয় টেস্টে সেঞ্চুরি পান ন্যাটা ব্যাটসম্যান জন রীড। যদিও ৯৮ রানের মাথায় তাঁর ক্যাচ ফশকান আহত কিরমানির বদলি উইকেটকীপার যশপাল শর্মা। শেষ দিনটিতে ব্যাটিং প্র্যাকটিসে মন দিয়ে নিউজিল্যাণ্ড পাঁচ উইকেটে দুশো ছিয়াশি রান তুলে সাজঘরে ফেরে। মরা ম্যাচ বাঁচল না।

তৃতীয় টেস্ট, অকল্যাণ্ড

চিরকালই অকল্যাণ্ডে স্পিন কাজ করেছে,সম্ভবত এমন চিন্তা মাথায় রেখে তিন স্পিনার যাদব, দোশি এবং রবি শাস্ত্রীকে নিয়ে শেষ মোক্ষম কামড় দিতে চাইল ভারত। ভঙ্গুর মিডল-অর্ডারে শক্তি জোগানোর জন্য শ্রীনিবাসনকে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ দেওয়া হল। কিন্তু সহজ পীচে ভারত যথারীতি গুটিয়ে গেল মাত্র ২৩৮ রানে। ১২৪ রানে ৮ উইকেট হারানোর পর নবম উইকেটে কিরমানি (৭৮) এবং যাদব (৪৩) অমূল্য ১০৫ রান যোগ করে ইনিংসের চেহারায় একটু শ্রী ফেরান। মানতেই হবে থুতনিতে সেলাই নিয়ে কিরমানি যে ইনিংসটি খেললেন, তার কাছে অনেক সেঞ্চুরিও ম্লান হয়ে যাবে।

আমরা যখন বিশ্বনাথ আর কপিলের ব্যাটে রানের দুর্ভিক্ষ লেগেছে কিনা ভাবছি তখন ওদিকে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম সিরিজ জয়ের চেষ্টায়

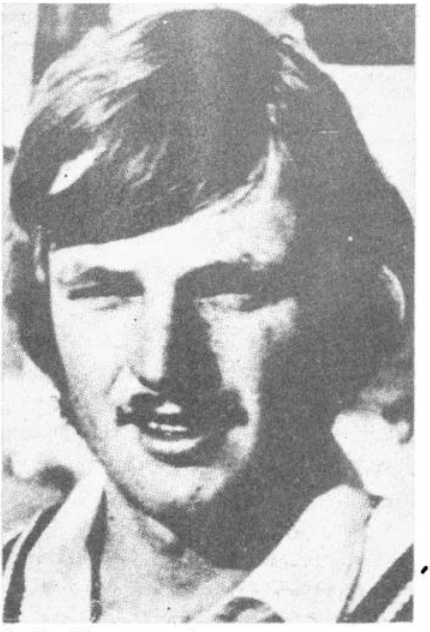

বিজয়ী অধিনায়ক হাওয়ার্থ

নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস জমাট হয়ে উঠল ৩৬৬ রানে। জন রাইটের ১১০, জন রীডের ৭৪ এবং জেমি কোনির ৬৫ ভারতের কোনো স্পিনারকেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার সুযোগ দেয়নি। তবু ওর মধ্যে শাস্ত্রী পাঁচ উইকেট নিয়ে নজর কাড়লেন।

১২৮ রানে পিছিয়ে থেকে ভারত শেষ দিনের মধ্যাহ্ন-বিরতিতে ইনিংস শেষ করে ২৮৪ রানে। কিছুটা বিশ্বনাথ এবং অবশ্যই পাটিলের শৌর্যময় ব্যাটিং ভারতকে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফিরিয়ে আনে। মাত্র ১৫৭ রানের চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে শেষ দিনের উইকেটে বহুখ্যাত ভারতীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে পাশাপাশি জয়ের স্বপ্ন এবং পরাজয়ের আতঙ্ক নিয়ে নিউজিল্যাণ্ড ব্যাটিং শুরু করে। কিন্তু বাধ্যতামূলক কুড়ি ওভারের শেষ পর্যন্ত যাবার আগেই আলোর অভাবে খেলার ওপর যবনিকা নামে। নিউজিল্যাণ্ডের রান তখন পাঁচ উইকেটে পঁচানব্বুই। ম্যাচ ড্র। অর্থাৎ ১-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল নিউজিল্যাণ্ড।

তারপর? ওখানে সিরিজ জেতার আনন্দে চিৎকার, চেঁচামেচি, হৈ-চৈ আর এখানে সঙ্গে-সঙ্গে রেডিওর চাবি ঘুরিয়ে কণ্ঠরোধ।

স্বাস্থ্য ঝলমল,
প্রাণে খুশী উচ্ছল

OBM 6617 BN

মজাদার বোর্নভিটা আপনার পরিবারকেও দিন।
স্বাদেভরা বোর্নভিটা, কোকো, মল্ট, দুধ আর
চিনির গুণে ভরপুর।

এবার ! বড়রকম সঞ্চয়,পুরো এক টাকার
রিফিল প্যাকের সঙ্গে

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

আপনাদের জন্যে গুণে ভরপুর

আগের কথা : শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি হাজারিবাগের পিসিমার কাছে পাওয়া এই পুরনো আঙটি ? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, তার আসল পরিচয় কী ? ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। সেখানে রহস্যময় মানুষ সিংহীবাবু ও সুখিয়ার খবর পায়। প্রয়াগ আর সুখিয়া কি একই লোক ? তারপর···

।। ১২ ।।

স্নান-খাওয়া শেষ করে দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিল শিশির। ঘুমের মধ্যে একবার গড়ের মাঠের সেই লোকটাকে স্বপ্ন দেখল। লোকটা সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকল শুধু। কিছু বলল না। চোখমুখ একবারে নির্বিকার। শিশির নিজেই কিছু বলতে যাচ্ছিল, ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভাঙার পর শিশির আলস্য-জড়ানো চোখ নিয়ে কিছুক্ষণ ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হাই তুলে উঠে বসল বিছানায়।

বাইরে রোদ মরে যাচ্ছে। পাখি ডাকছিল বাগানে। বাড়ি একেবারে চুপচাপ নয়; পিসিমার গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

জল তেষ্টা পেয়েছিল শিশিরের। উঠে পড়ল।

ভেতরের বারান্দায় এসে দেখল পিসিমা শুকনো কাপড়চোপড় তুলে নিয়ে গুছিয়ে একপাশে জড় করছে।

জল চাইল শিশির।

আশালতা জল এনে দিলেন।

শিশির জল খেয়ে গ্লাসটা বাড়িয়ে দিচ্ছে পিসিমার দিকে, আশালতা বললেন, "দাদা এতক্ষণে টেলিগ্রাম পেয়ে গিয়েছে, কী বলিস ?"

"এত তাড়াতাড়ি ? সন্ধে নাগাদ পেয়ে যেতে পারে।"

"তাও ভাল। অকারণ একজনকে ভোগানো।" বলে আশালতা একটু থেমে ক্ষোভের গলায় বললেন, "আজকাল লোকজন বড় নচ্ছার হয়ে গিয়েছে। নয়তো অমন করে কেউ মিথ্যে-মিথ্যে টেলিগ্রাম করে !"

শিশির চুপ করে থাকল।

"তোর পিসেমশাই বলছিলেন, কেউ শয়তানি করে এমন কাজ করেছে।"

শিশির মাথা নাড়ল। "কোনো সন্দেহ নেই।"

"তুই কিন্তু হুটহাট করে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াবি না।"

শিশির হাসল। বলল, "না-বেড়ালে শয়তানটাকে ধরব কেমন করে।"

"তোকে আর শয়তান ধরতে হবে না।"

শিশির আবার একটু হেসে সিঁড়ি দিয়ে ভেতরের চাতালের দিকে নেমে গেল। এটা বাড়ির পেছন দিক। খানিকটা বাঁধানো চাতাল, তারপর কুয়োতলা, আশেপাশে কয়েকটা কলা আর পেঁপে গাছ।

আকাশ, গাছ দেখতে-দেখতে শিশির বাঁধানো কুয়োর কাছে এসে দাঁড়াল। বংশীর আসতে দেরি আছে। বলেছে একেবারে শেষ বিকেলে আসবে। বংশী এলে দু'জনে বেরুবে। কোথায় যাবে তা অবশ্য ঠিক নেই। ঘুরেফিরে হয়ত বংশীর দোকানে গিয়েই খাবে।

আজ বংশীর দোকান থেকে ফেরার সময় শিশির সিংহীবাবুর খোঁজ করেছে। রেল-ফটক পেরিয়ে ডান দিকের বাড়িটা যদি সিংহীবাবুর হয় তবে ভদ্রলোক ও-বাড়িতে নেই। দরজা-জানলা সব বন্ধ। তালা ঝুলছে বাইরের দরজায়। কারও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আশেপাশে, কাছাকাছি, অন্য বাড়ি নেই। তফাতে আছে।

শিশির ভাল করে অন্য খোঁজ নিতে পারেনি। তবু তার মনে হচ্ছে, সিংহীবাবু বাড়িতে নেই, ফাঁকাই পড়ে আছে বাড়িটা।

এখন কথা হল, সিংহীবাবু আর সেই গড়ের মাঠের লোক একই কি না ! চোখে না-দেখা পর্যন্ত শিশির কিছু বলতে পারে না। হয়তো আলাদা লোক। তা যদি হয়, তবে যাও-বা একটু ধরাছোঁয়া যাচ্ছিল রহস্যটার, তাও গেল।

অবশ্য একটা ব্যাপারে শিশির নিঃসন্দেহ। রহস্য যতই জটিল হোক এখানেই তার সূত্র রয়েছে। কারণ মিথ্যে টেলিগ্রাম করে আনানো হয়েছে শিশিরকে। আর সেটা অকারণে হতে পারে না।

শিশির বাঁধানো কুয়োর পাড়ে বসল একটু, তারপর উঠে পড়ল, হাতমুখ ধুয়ে বরং তৈরি হওয়া যাক। বংশী এলে বেরিয়ে পড়বে।

বংশীর আসতে দেরিই হল সামান্য। শশধর তখন বাগানের কাজ সেরে ঘরে ঢুকছিলেন। শিশির সেজেগুজে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় চললে?"

"একটু ঘুরে আসি। বংশী এসেছে।"

"রাত কোরো না।"

"না।"

বংশী ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। শিশির কাছে এসে বলল, "চলো।"

দু'জনে মাঠ ভেঙে হাঁটতে লাগল।

শিশির বলল, "বংশী, তোমার সেই সিংহীবাবু বোধ হয় নেই। বাড়ি তালাবন্ধ।"

বংশী বলল, "দেখেছ তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু শুনলাম আছেন।"

"আছেন?" শিশির অবাক হল।

বংশী বলল, "দুপুরে বাড়িতে শুনলাম সিংহীবাবু আছেন।"

"কে বলল?"

"আমাদের বাড়িতে লেটুয়া বলে একজন কাজ করে। তার বাবা বেশ খানিকটা পাগলা ধরনের। গাঁয়ে লেটুয়াদের বাড়ি। ওর বাবা বাড়ির এটা-ওটা কুমড়ো, ঝিঙে এনে সকালে বাজারে বেচতে বসে। দু'এক টাকা যা বেচতে পারে তাই লাভ। লেটুয়ার বাবা সিংহীবাবুর কাছে যায়। সিংহীবাবু তাকে ওষুধ দেয় খেতে।"

"ওষুধ! কী ওষুধ?"

"পাগলামি সারানোর ওষুধ।...তা আমি লেটুয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, সে তো বলল, তার বাবা সিংহীবাবুর দাবাই খাচ্ছে।"

শিশির বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, "কিন্তু আমার তো বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে মনে হল, ও-বাড়িতে কেউ থাকে না।"

বংশী বলল, "তোমার ভুল হয়েছে। চলো না, যাবার সময় দেখে যাই।"

"চলো।"

হাসপাতালের দিকে হাঁটতে লাগল দু'জনে। মাঠ ভেঙে এগিয়ে গিয়ে বড় রাস্তা ধরবে।

আলো কমে আসছে। বাতাস দিচ্ছিল। আকাশে কোথাও তেমন মেঘ নেই, তবু বাতাসটা বাদলা-বাদলা লাগছিল।

বংশী বলল, "আচ্ছা, একবার থানায় গেলে কেমন হয়?"

"থানা! কেন?"

"থানায় গিয়ে ওই ফল্‌স্ টেলিগ্রামটার কথা বললে হয়। আমার চেনা-জানা আছে থানার ছোট দারোগার সঙ্গে। বাঙালি। রায়বাবু। হেমচন্দ্র রায়।"

শিশির কথাটা ভেবে দেখেনি আগে। থানায় গিয়ে ব্যাপারটা জানানো যায় কিনা তাও সে জানে না।

"থানায় গিয়ে লাভ হবে?" শিশির বলল।

"লোকসানই বা কী! ব্যাপারটা তো চিটিং।"

"হ্যাঁ, একটা মতলব নিশ্চয় আছে।"

"আমি তাই ভাবছিলাম—থানায় গিয়ে একবার জানিয়ে এলে হয়।"

"আচ্ছা সে হবেখন। আগে সিংহীবাবুর পাত্তা নাও।"

রাস্তায় পৌঁছে গিয়েছিল শিশিররা। খানিকটা দূরে সিংহীবাবুর বাড়ি।

বংশী বলল, "আচ্ছা, তুমি সিংহীবাবুর খোঁজ করছ কেন?"

"আমি খোঁজ করছি! কই, না!"

"বাঃ, তুমিই তো একজন—একজন কেন হবে দু'জনের ডেসক্রিপশান দিলে, বললে-আমি এদের কাউকে ওখানে দেখেছি কিনা।"

শিশির বুঝতে পারল সে ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছে। বংশী কিছুই জানে না। টেলিগ্রামের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাই শিশির বংশীকে বলেনি।

শিশির ভাবল সামান্য; বলল, "ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। তোমায় সব কথা বলিনি।"

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বংশী। "মানে?"

"মানে—মানে তুমি সব জানো না। আমি একটা ব্যাপারে দু'জনকে সন্দেহ করছি। তাই তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

"ও! তা তোমার ব্যাপারটা কী?"

শিশির তাকাল বংশীর দিকে। "ব্যাপারটা জটিল। তোমায় পরে বলব। তবে এটুকু জেনে

রাখো, ওই টেলিগ্রাম করানোর মধ্যে একটা মতলব রয়েছে। আমায় কলকাতা থেকে এখানে ধরে আনা।"

"কেন?"

"এখন বুঝবে না। সব শুনলে বুঝতে পারবে।"

"ও!"

সিংহীবাবুর বাড়ির সামনে চলে এসেছিল শিশিররা। বংশী হাত তুলে দেখাল। "এই বাড়ি।"

অন্ধকার হয়নি, তবু ঝাপসা ভাব হয়েছে চারদিকে। আকাশের তলায় আলো নেই। দু' টুকরো মেঘ ধীরেসুস্থে ভেসে যাচ্ছে। সিংহীবাবুর বাড়ির বাইরে সামান্য পাঁচিল। ভেতরে গাছপালা। ছোট একটা ফটক সামনে। ফটক খোলাই ছিল, তালা পড়েনি। বাড়িতে লোকজন আছে বলে মনে হচ্ছিল না। চুপচাপ।

বংশী ফটক খুলে ভেতরে ঢুকল। পেছনে শিশির।

পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘরের বাইরে তালা ঝুলছে। অন্য ঘর ভেতর থেকে বন্ধ।

বংশী দু'চার ধাপ সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠল তালাবন্ধ ঘরের সামনে দাঁড়াল। দেখল এদিক-ওদিক।

শিশির বলল, "তখন আমি এই রকমই দেখেছি। বাড়িতে লোক নেই।"

বংশী অকারণে বার দুই ধাক্কা মারল দরজায় "অবাক কাণ্ড।"

"কেন?"

"আমায় বলল আছে...."

"ভুল বলেছে। বাড়িতে লোক থাকলে এই দশা হয় বাড়ির? দেখছ না, সারা বারান্দা ধুলোয় ভর্তি।"

বংশী দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য। তারপর বলল, "ঠিক আছে, আমি খোঁজ নিয়ে নেব।"

শিশির বারান্দা থেকে নেমে আসছিল, হঠাৎ বংশী বলল, "আরে, তালা তো খুলে গেল।"

শিশির থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘুরে দাঁড়াল।

বংশী বলল, "আমি তালাটা দেখছিলাম। খুলে গেল।"

শিশিরও দেখল দরজার কড়ায় তালাটা ঝুলছে।

"কী ব্যাপার বলো তো?" বংশী বলল।

শিশির নিজেই অবাক হয়েছিল। বলল, "তালাটা বোধ হয় ভাল-মতন লাগেনি। তুমি ধাক্কাধাক্কি করেছ, টেনেছ, খুলে গিয়েছে।"

"সিংহীবাবু তালা লাগিয়েছেন অথচ ভাল করে দেখেননি তালাটা লেগেছে কি না?"

"ভুল তো হয় মানুষের।"

"তা হলে চলো ভেতরটা একবার দেখে যাই।"

শিশির বারণ করতে যাচ্ছিল, তার আগেই বংশী দরজার তালা খুলে ফেলে জোর ধাক্কা দিল দরজায়।

দরজা খুলে গেল। (ক্রমশ)

ছবি: সুনীল পাল

ছোটদের যত সেরা বই

অজেয় রায় নবীন লেখক, কিন্তু সন্দেহ নেই যে, শুধু 'ফেরোমন' বইটির জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কুর নানান রকম বৈজ্ঞানিক কাণ্ডকারখানা যেমন নিত্যনতুন আনন্দের অফুরন্ত উৎস, অজেয় রায়ের কলমে তৈরী চরিত্র 'মামাবাবু' ওরফে প্রফেসর নবগোপাল ঘোষ এবং তাঁর সঙ্গী অভিযাত্রীদের বিজ্ঞানভিত্তিক দুঃসাহসিক অভিযানের এই কাহিনীগুলিও তেমনই এক দুর্লভ আনন্দ যোগাবে। শ্বাসরুদ্ধকর কৌতূহলকে কাহিনীর শেষ পর্যন্ত টেনে রাখতে অজেয় রায়ের দক্ষতা বিস্ময়কর। সত্যজিৎ রায় যে 'ফেরোমন' বইটিকে বহু পুরোপাতা ছবি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন, এ-খবরও কম আকর্ষণীয় নয়।

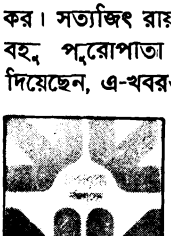

মঞ্জিল সেন তাঁর 'ডাকাবুকো' উপন্যাসটি লিখেছেন একটি ছোট্ট মেয়ের দুঃসাহসিক কীর্তিকাণ্ড নিয়ে। মেয়েটির নাম কাকলি। বড় লোক বাবার একমাত্র মেয়ে। যেমন ডাকাবুকো, তেমনি দস্যি সেই মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল এক দুর্বৃত্ত দল। কাকলির বাবার কাছে তারা চাইল এক লাখ টাকা। কাকলির বাবা টাকা দিতে রাজী হলেন। কিন্তু ডাকাবুকো মেয়ে কাকলি অত সহজে হার মানবার পাত্রীই নয়। কেমন করে সে গোটা দুর্বৃত্তদলটাকে জব্দ করে উদ্ধার পেল, তাই নিয়েই এই রীতিমতো বুক-ধড়াস-ধড়াস-করা গল্প। সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের আঁকা দারুণ দারুণ ইলাসট্রেশন।

শিশিরকুমার মজুমদারের তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫ **অন্নদাশংকর রায়ের** হৈ রে বাবুই হৈ ৫ **মঞ্জিল সেনের** ডাকাবুকো ৬ **রেবন্ত গোস্বামীর** অক্রমিতুদের কথা ৪ **সুবোধ ঘোষের** সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৬ **সত্যজিৎ রায়ের** নানা স্বাদের কাহিনী : এক ডজন গপ্‌পো ১২ আরো এক ডজন ১২ ফটিকচাঁদ ৮ **পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের** মাধুরীলতার চিঠি ৫ মাধুরীলতার গল্প ৬ **নারায়ণ চক্রবর্তীর** হলদে সবুজ কৃষ্ণাল ১০ **পূর্ণেন্দু পত্রীর** কী করে কলকাতা হলো ৫ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৫ কলকাতার রাজকাহিনী ৫ **মৌমাছির** রাজার রাজা ৭ **সরলাবালা সরকারের** পিনকুর ডাইরি ৩ **পাপু (সুব্রত সরকার)-র** পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫ **সংকর্ষণ রায়ের** গভীর গহন ৭ **পার্থসারথি চক্রবর্তীর** কেমিক্যাল ম্যাজিক ৫ মজার এক্সপেরিমেণ্ট ৫ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা ৫ রসায়নের ভেল্‌কি ৪ ম্যাজিকের মতো মজা ৫ তত সহজ ছিল না ৫ **সুকুমার রায়ের** সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম ২৫ ২য় ৩০ জীবজন্তু ৮ সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০ **বুদ্ধদেব গুহর** ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫ মউলির রাত ৫ বনবিবির বনে ৬ **নলীগোপাল চক্রবর্তীর** চরকাবুড়ি ৬ যাদুঘরে চল যাই ৬।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

যা দেখেছি যা পেয়েছি

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৯১৮ সালের অগস্ট মাস। তখনও প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। সেই যুদ্ধে আহত হয়ে প্রায় এক বছর হাসপাতালে কাটিয়ে তরুণ ইংরেজ কবি উইলফ্রেড ওয়েন আবার ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে পাড়ি দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে এই ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের প্রতি তাঁর প্রবল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা লিখেছেন, বার্কেনহেড স্কুলের ছাত্ররূপে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেছেন, অসুস্থ শরীরের জন্য স্বদেশ ছেড়ে ফ্রান্সের বোর্দো শহরে এক ফরাসি পরিবারে গৃহশিক্ষকের কাজও নিয়েছেন। এমন সময় এসেছে যুদ্ধের আহবান, সৈন্যদলে নাম লেখাতে হয়েছে তাঁকে। ট্রেঞ্চে বসে যুদ্ধের বিধ্বংসী-নিষ্ঠুর চেহারা দেখে আর অযথা লোকক্ষয় দেখে তীব্র বেদনা বোধ করেছেন। সেই বেদনা-ই ব্যক্ত হয়েছে যুদ্ধ-চলাকালীন লেখা তাঁর কবিতাগুলিতে। তিনি অনুভব করেছেন, যুদ্ধে কোনো পক্ষেরই কল্যাণ নেই, মঙ্গল নেই।

এ-সব সত্ত্বেও যুদ্ধবিরোধী এই কবিকে দীর্ঘ চিকিৎসা ও ছুটির শেষে আবার যুদ্ধক্ষেত্রেই ফিরে যেতে হচ্ছে। যাবার আগে তিনি মায়ের কাছে বিদায় নিতে এসেছেন। দুজনের চোখেই বিষাদ, তাঁরা তাকিয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে। এদিকে ইংল্যাণ্ড, ওদিকে ফ্রান্স, মাঝখানে সূর্যালোকে ঝলমল করছে সমুদ্রের জলরাশি। মা আর ছেলে দুজনেই আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর। সান্ত্বনা দেবার ছলে মায়ের উদ্দেশে ওয়েন তখন আউড়ে চলেছেন ঃ

"যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।"

(When I go from hence let this be my parting word that what I have seen is unsurpassable.)

রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র এই সুবিখ্যাত কবিতাটি আবৃত্তি করে ওয়েন যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হলেন। সেই তাঁর শেষ যাত্রা। কম্পানি কমাণ্ডার হয়ে যুদ্ধে যোগ দেবার অল্পকাল পরেই অক্টোবর মাসে তাঁর ভাগ্যে শিরোপা জুটল, 'মিলিটারি ক্রস' পদকও লাভ করলেন। কিন্তু তার পরেই ঘনিয়ে এল তাঁর 'যাবার দিন'। যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়ার মাত্র সাতদিন আগে ৪ নভেম্বর ফ্রান্সের রণাঙ্গনেই মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সৌন্দর্যের উপাসক এই কবির অকালমৃত্যু ঘটল। যুদ্ধবিরতির দিনে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পৌঁছল মা সুজান এইচ ওয়েনের কাছে। ক'দিন পরেই ওয়েনের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ফিরে পেলেন তিনি। তারই মধ্যে পুত্রহারা জননী খুঁজে পেলেন মৃতপুত্রের

উইলফ্রেড ওয়েন

When I go from hence let this be my parting word, that what I have seen is unsurpassable.

I have tasted of the hidden honey of this lotus that expands on the ocean of light, and thus am I blessed — let this be my parting word.

In this playhouse of infinite forms I have had my play and here have I caught sight of him that is formless.

My whole body and my limbs have thrilled with his touch who is beyond touch; and if the end comes here, let it come — let this be my parting word.

গীতাঞ্জলি'র সেই কবিতা

When I go from hence let this be my
parting word, that what I have seen
is unsurpassable.
I have tasted of the hidden honey of
this lotus - that expands on the ocean of light,
and thus am I blessed - let this be
my parting-word.
In this playhouse of infinite forms,
I have had my play, & here have I
caught sight of Him that is
formless.
My whole body & my limbs have
thrilled with His touch who
is beyond touch; and if the
end comes here, let it come
- let this be my parting word

Tagore.

ওয়েন-এর পকেট-বুকে তার অনুলিপি

পকেট-বই। তাতেই তিনি আবিষ্কার করলেন ওয়েনের হস্তাক্ষরে বিদায়কালে উচ্চারিত 'গীতাঞ্জলি'র ওই সুপরিচিত কবিতা—নীচে রবীন্দ্রনাথের নাম। পুত্রশোকাতুরা সুজান এই নিদারুণ ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রায় দু'বছর পর ১৯২০ সালের ১ অগস্ট ইংল্যাণ্ড ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথকে এক অতি মর্মস্পর্শী চিঠি লেখেন। যাঁর কবিতা তাঁর পুত্রের জীবনকে এমন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, সেই রবীন্দ্রনাথের কাছে জননী-হৃদয়ের যন্ত্রণা তুলে ধরে কিছুটা যেন সান্ত্বনা পেতে চেয়েছিলেন তিনি। পুত্রের কবিতা-সংকলনখানি পড়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে এই চিঠিখানি পুরোপুরি উদ্ধৃত করেছেন। শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদনে সুজান ওয়েনের লেখা এই চিঠি এবং সেইসঙ্গে উইলফ্রেড ওয়েনের পকেট-বইয়ে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির অনুলিপি সযত্নে রক্ষিত আছে। বিশ্বভারতীর সৌজন্যে তা এই রচনার সঙ্গে মুদ্রিত হল।

যেখানেই যান, যে-কাজই করুন
স্বাচ্ছন্দ্যময় চলা-হাঁটার উপরই
নির্ভর করছে আপনার সাফল্য।

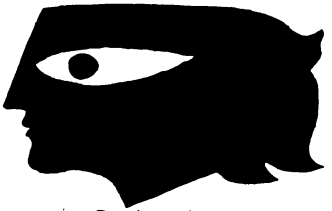

রাজুর তৈরী টেকসই গেঞ্জী,জাঙ্গিয়া,
মোজাই আপনাকে জোগাতে পারে
সেই বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য, এবং কম
খরচে। কেনার সময় খোঁজ করবেন—

১। প্রেসটিজ রঙীন জাঙিয়া
২। রঙীন ড্রয়ার্স
৩। ডাক্কর জাঙিয়া
৪। ফ্রেদার-ফিট রিব গেঞ্জী
৫। ইজিপসিয়ান গেঞ্জী
৬। কুলফিল গেঞ্জী

গেঞ্জী জাঙ্গিয়া
মোজার রাজা

RAJU

ডো-ডো মামা

সত্যেন্দ্র আচার্য

ডো-ডো মামা আজ এলেন অদ্ভুত সাজে। আমরা স্কুল থেকে ফিরছি, হালুম আর আমি, মামার সঙ্গে গলির মুখেই দেখা। ডো-ডো মামা একটা মোটর-সাইকেলের ওপর বসে। দুদিকে দুই পা। সেই পা দিয়ে মাটিতে তাল রেখে রেখে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

মাথার ওপর বাঁধাকপির মতো নীল রঙের গোল পাগড়ি এবার নেই। তার বদলে কান-ঢাকা গোল টুপি। চোখে গগল্‌স্। কিন্তু দুটো কাচ দু রঙের। একটা সাদা, আর একটা কালো। গরমে হাফ প্যান্ট। গায়ে লাল রঙের পাঞ্জাবি। হাফ হাতা। তাও আবার প্যান্টের ভেতরে গোঁজা। পায়ে ফুল মোজা। উলের। ক্যাম্বিসের জুতো তার ওপর শোভা পাচ্ছে। ডান পায়ের হাঁটুতে নীকাপ। ফুটবল প্লেয়ারদের মতো।

ডো-ডো মামার সামনের দুটি দাঁত নেই। বলে থাকেন, বাঘের থাবায় হারিয়েছে। দাঁত দুটি বাঁধানো। একটির মাঝখানে সোনার পেরেক ঠোকা। কাঁধে একটি ঝোলা। ঝোলার ওপর ছুটন্ত বাঘের ছবি আঁকা।

মোটর-সাইকেল চেপে মামার ওই ধরনের এগোনো দেখে প্রথমে আমাদের মনে হল, বোধহয় তেল ফুরিয়ে গেছে। তাই ভটভটি তাঁকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, তিনিই ভটভটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। পেছনে-পেছনে গোটা তিনেক রাস্তার কুকুর জড়ো হয়েছে। দাঁত বের করে চেল্লাচ্ছে মামাকে দেখে। ডো-ডো মামার ভটভটি নীরব। মামার মুখেও কোনও

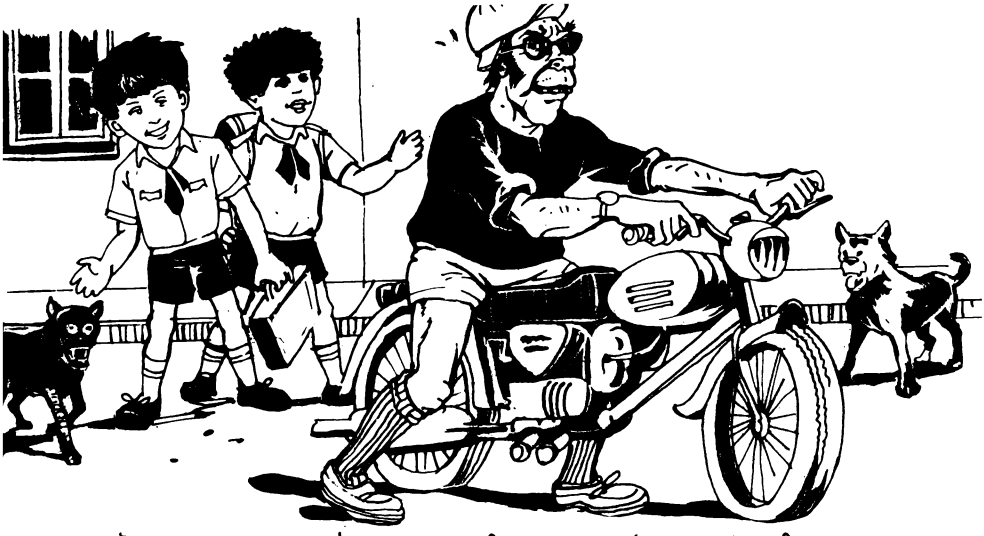

শব্দ নেই। হুঙ্কার ছাড়লেন হঠাৎ আমাদের দেখতে পেয়ে। গাড়ির ওপর বসেই হর্ন বাজালেন প্রথমে। তারপর বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "এই হালুম—"

"মামা যে।" ভয়ে ভয়ে হালুম সামনে এসে দাঁড়াল।

ডো-ডো মামা যেন খেপে গেলেন। সীটের ওপর বসেই বাঘের মতো হুঙ্কার দিলেন। "শুধু মামা?" তারপর চুল ধরে সজোরে টান দিয়ে বললেন, "এতবড় ভুল সহ্য করব? ডো-ডো মামা বলতে হয় জানো না?"

কাঁদো-কাঁদো মুখে হালুম এবার মামার দিকে তাকাতেই ডো-ডো মামা যেন ছড়া মেলালেন। "কী হে মানুষরূপী হালুম, হচ্ছে এবার মালুম?"

পাঞ্জাব-মামা হিসেবেই মামার খ্যাতি বেশি। তাঁর দাবি, তিনি পাঞ্জাবের লোক। আসলে পুরোপুরি বাঙালি। আসল বাড়ি উত্তরবঙ্গে। গতবারে বলে গিয়েছিলেন, "আবার যখন আসব, তখন আমি ডো-ডোর গুরু। তোদের তখন ডো-ডো মামা। ডো-ডো মামা এই সম্মান দিতে ভুলিস না।"

"ডো-ডো কী মামা?" হালুম জিজ্ঞাসা করেছিল!

"যুযুৎসু। শুধু মানুষ নয়, বাঘ, সিংহ থেকে পাগলা হাতি পর্যন্ত কাত করার প্যাঁচ। শুধু একবার এইস্যা-এইস্যা। ব্যাস্, স্যাট-স্যাট।" মামা হাত-পা কত কায়দায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কসরত দেখিয়ে বললেন, "বাঘা-বাঘা হিংস্র জন্তু পর্যন্ত তখন দেখবি তোদের ডো-ডো মামার পায়ের তলায় পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে।"

হালুমের বগলের ভেতর দিয়ে ঘাড়ের পেছনে চাপ দিলেন মামা। হালুম চিৎকার করে উঠতেই মামা বললেন, "এটা জাপানি। মিঠে-কড়া।" তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, "এরপর আসব যখন, তখন মনে থাকে যেন। ডো-ডো মামা বলে ডাকবি। ভুলিস না।"

"না না, ভুলব কেন, ভুলব কেন?"

কিন্তু এই ভুল হতেই ডো-ডো মামার অসম্মান হল। তাই মিঠে-কড়া প্রয়োগ করলেন চুল টেনে। তারপর কটমট করে তাকিয়ে বললেন, "ঠ্যাল। পেছন দিক থেকে গাড়িটাকে গায়ের জোরে ঠ্যাল।"

হালুম আর আমি পেছন থেকে প্রাণপণে মোটরসাইকেল ঠেলছি, কুকুরগুলো পিছু-পিছু ডাকতে ডাকতে এগোচ্ছে। ডো-ডো মামা আমাদের পেয়ে সম্রাটের মতো সীটের ওপর বসে মাটিতে পায়ের তাল রেখে শুধু উৎসাহ দিলেন, "আসছে বছর তোদের নিয়ে যাব সঙ্গে।"

"কোথায়, ডো-ডো মামা?" হালুমের খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবু ভরসা করে বলল, "গাড়ি থেকে একটু নামলে হত না ডো-ডো মামা?"

ও কথার কোনও উত্তর না দিয়ে ডো-ডো মামা শুধু বললেন, "টিং টিং অরণ্যে!"

ততক্ষণে ডো-ডো মামা তাঁর অকেজো

মোটর-সাইকেল চড়ে প্রায় আমাদের বাড়ির দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছেন। নেমে বললেন, "শুধু লেখাপড়া শিখলেই চলে না। শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য ডো-ডোর কৌশলকেও জানতে হবে।" ডো-ডো মামা উপদেশবাণী ছড়াতে ছড়াতে সোফায় গিয়ে বসলেন। জুতোসুদ্ধু পা তুলে। হাঁটু মুড়ে। বসে বললেন, "হালুম, রান্নাঘরে খবর দে। জলখাবারটা মুখরোচক এবং পেটরোচক হয় যেন সেদিকে লক্ষ রাখিস।"

"পেটরোচক মানে কী, ডো-ডো মামা?" হালুম জিজ্ঞাসা করতেই ডো-ডো মামা খেপে লাল। নিজের ভুঁড়িতে গোটা তিনেক চাপড় মেরে বললেন, "মুখ্খু মুখ্খু, যে সুখাদ্য পেটভরার পক্ষে যথেষ্ট, তাই পেটরোচক।"

যে কুকুরগুলো এতক্ষণ ধরে ডাকতে ডাকতে পেছন-পেছন আসছিল, তারা ডো-ডো মামার গাড়িটাকে শুঁকে ফিরে গেছে। মামা বললেন, "এখান থেকে একটা ডো-ডোর প্যাঁচ লাগাব দেখবি? কুকুরগুলো স্যাট-স্যাট মাটিতে পড়ে গিয়ে ল্যাজে-গোবরে একসা হবে?"

"এত দূর থেকেও প্যাঁচ হয় ডো-ডো মামা?"

"হয়।" ডো-ডো মামা গর্বের হাসি হাসলেন। "জানলেই হয়। মহাভারতের দুই যুগ আগে শব্দভেদী বাণ ছিল না?"

হালুম রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বলল, "সে-প্যাঁচ জাপানি না জার্মানি ডো-ডো মামা?"

"ভারতীয়। স্রেফ ভারতীয়।" তিনি গর্বের হাসি ঠোঁটের ওপর রেখে বললেন, "প্যাঁচের কাছে ভারতকে পেছনে রেখে এগিয়ে যাবে—পৃথিবীতে এমন কোন্ দেশ আছে র‍্যা?" তারপর একটু যেন দম নিলেন। রান্নাঘরের খোঁজ-খবর নিলেন। নিয়ে বললেন, "তোদের রান্নাঘর ধাপায় নাকি, এত যে দেরি হচ্ছে?" পরক্ষণেই গর্বের সুরে বললেন, "যাক তো ওদের কেউ টিং টিং অরণ্যে!"

"টিং টিং অরণ্য!" হালুম অবাক গলায় বলে।

"হ্যাঁ। বাঘ, সিংহ আর পাগলা হাতির রাজ্য সেটা। আদম-শুমার যেমন লোকগণণার ব্যাপার, তেমনি তাদের শুদাম আমর করতে হবে আমাকে। জন্তুদের সামনের পায়ে নম্বর লেখা কাচের প্লেট তামার তার দিয়ে লটকে দিতে হবে। যাক তো কোনও জাপানি বীর কিংবা জার্মান? এটা তিন হাত বহরের আফ্রিকার কাশফুলের জঙ্গল নয়, খাঁটি টিং-টিং অরণ্য। এটা কাঁচামিঠে আম নয়। যুযুৎসু।"

এতক্ষণ ধরে ডো-ডো মামা তিনজনের লুচি হালুয়া একলা সাবাড় করে ঢেকুর তুললেন। তুলেই আমাদের ওপর খেপে গেলেন। তাঁর গোল-গোল চোখ আমাদের শরীরের ওপর লাট্টুর মতো বনবন করে ঘুরছে। ডো-ডো মামা বললেন, "দেখি কেমন জ্ঞান হয়েছে তোদের। সেই টিং-টিং অরণ্যটা কোথায়? বল, আটলান্টিকের পাদদেশে, না থর মরুভূমির বুকের ওপর?" তারপর ছড়া কাটার ভঙ্গিতে বললেন :

জলদি বল ভাবনা করে
নইলে গাঁট্টা মারব জোরে
সঠিক হলেই চ্যারিটি শো
হামারা পাস টিকিট দো

হালুম আর আমি মুখ চাওয়াচায়ি করলাম। উত্তর সঠিক না হলে ডো-ডো মামা ভারতীয় কায়দায় মাথার তালুতে ঠকাস-ঠকাস করে তবলা বাজাবে। আর উত্তর সঠিক

হলেই দুটো ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট দেবেন হালুম আর আমাকে। দুজনে ঘাবড়ে গেলাম বেজায়। কারণ আটলান্টিক মহাসাগর তো আর পর্বত নয় যে, তার পাদদেশে টিং-টিং অরণ্য হতে পারে? আবার থর তো মরুভূমি। তার বুকের ওপর অরণ্য আসবে কোথা থেকে?

কিন্তু চ্যারিটি শো'র দুখানি টিকিট ডো-ডো মামার পকেটে গেছে শুনে ঘাবড়ে গেলাম দুজনে। লোভে জিভে জল আসার মতো। হালুম সাহসে ভর করে বলল, "ডো-ডো মামা, আবিসিনিয়ার উত্তরে এক—"

কথা শেষ না হতেই ডো-ডো মামা যেন চালাকি ধরে ফেললেন। অমনি ছড়ার ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, "টিকেট দুটো দ্যাখ্ রে দ্যাখ্।"

ভরসা করে আমিও চেষ্টা করলাম। পাছে ধরে ফেলেন, তাই বিজ্ঞের মতো বললাম "এস্কিমোদের রাজ্য ছেড়ে মালভূমিটার পাশে—"

ডো-ডো মামা সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও থামিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দু' আঙুলে বুক-পকেট থেকে সেই টিকিট দুটো একটু উঁচু করে আবার পকেটের ভেতর ছুঁবিয়ে দিয়ে পদ্য মেলালেন, "টিকেট দুটো মুখটি তুলে খিলখিলিয়ে হাসে।"

ডো-ডো মামা এবার লুচি-হালুয়ার বেশ লম্বা করে আর একটা ঢেঁকুর তুলে গর্জে উঠলেন। "এই, এবার কিন্তু ওয়ান, টু, থ্রী বলব আমি। সেই সময়ের মধ্যে সঠিক উত্তর দিতে না পারলেই মস্তকের তালুতে খাঁটি ইণ্ডিয়ান ডো-ডো।" ডো-ডো মামা হাঁক ছাড়লেন—"ওয়ান।"

আমি নিরুত্তর। হালুম চোখ বুজে।

"টু।" কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ডো-ডো মামার খেয়াল হল, তাঁর সামনের সোনার পেরেক-ঠোকা দাঁতটি কোথায় পড়ে গেছে। পরক্ষণেই ডো-ডো মামা মাথায় হাত দিয়ে মেঝেতে বসে পড়লেন। "আমার সাধের দাঁত?"

আসলে ডো-ডো মামা যখন ওই বিদঘুটে পোশাকে পা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন তখন রাস্তার কুকুরগুলো সামনে জড়ো হয়ে দাঁত খিঁচিয়েছিল। ডো-ডো মামাও নানা ভঙ্গিমায় দাঁত খিঁচিয়ে বদলা নিয়েছিলেন। সেই মুহূর্তেই এই অঘটন। মুখ-বিকৃতির চোটে সাধের দাঁতের সাধ্য কী যে ঠিক জায়গায় বসে থাকে?

ডো-ডো মামা আর থ্রী বলবার সময় পেলেন না। ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেলেন সোনার পেরেক-ঠোকা দাঁত খুঁজতে। যাবার আগে টিকেটদুটো ছুঁড়ে দিলেন আমাদের পায়ের কাছে। হালুম টিকেটদুটো কুড়িয়ে নিয়ে আওয়াজ দিল, "ডো-ডো মামা ডো-ডো শিখেও দাঁতের কাছে কাত।"

ডো-ডো মামা তখন ভটভটির ওপর চেপে বসেছেন। তারপর মাটিতে পায়ের তাল ঠুকে ঠুকে ভটভটি চেপে রাজার মতো এগিয়ে যেতে যেতে মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন, "একটি গেছে হাওয়া খেতে থলিমে আউর সাত।"

ছবি: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ইংল্যাণ্ডের রাজপ্রাসাদে দরবার বসেছে। যুবরাজ (পরে যিনি সপ্তম এডোয়ার্ড নামে সিংহাসনে বসেন) প্রজাদের মধ্যে সম্মান বিতরণ করছেন। রাজকীয় নৌবাহিনীর একজন অফিসার কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে নত হয়ে সম্মান গ্রহণ করতে যাবেন এমন সময় ঠং করে এক শব্দ। অফিসারের পকেট থেকে দশ শিলিংয়ের একটি স্বর্ণ-মুদ্রা মেঝেতে পড়ল। অফিসার এদিক-ওদিক সেটি খুঁজছেন, অনেকে হাসি চেপে রাখবার চেষ্টা করছেন। অবশেষে অফিসারটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "মহামহিম, আমার জন্যে দরবারের কাজে বিলম্ব হচ্ছে। তাতে আমি দুঃখিত। কিন্তু ওই মুদ্রাটি না পেলে আমি রেলের টিকিট কেটে আমার কর্মস্থলে কাল ভোরের মধ্যে ফিরতে পারব না। তা হলে সামরিক আদালতে আমার বিচার হবে।" সবাই এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। তখন যুবরাজ গম্ভীর হয়ে বললেন, "রাজকোষের মাননীয় অধ্যক্ষ কি সাময়িকভাবে ওই অর্থের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন?" বিস্মিত চ্যান্সেলর অব দি এক্সচেকার একটু নড়ে-চড়ে বসতেই দেখা গেল মুদ্রাটি তাঁর জুতোর তলায় লুকিয়ে ছিল।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গাবলু
লজেন্স
মিষ্টান্ন
মিষ্টান্ন
মিষ্টান্ন
মিষ্টান্ন

কোন্‌টা ঠিক, কে বলবে

বাচস্পতি

॥ ২ ॥

এবার আর বাবার হো-হো হাসিকে থামানো গেল না। মেঝে থেকে মৃত মশাটিকে দু-আঙুলে তুলে ধরলেন, তারপর আরেকটা আদরের নামে ডেকে বললেন, "হিগিনবথাম, তুই অবাক করলি। ভাষাবিজ্ঞান দিয়ে এমন চমৎকার মশা মারা যায় কে জানত? রোজ সন্ধেবেলায় এসে হাজার দুয়েক ফরাসি ইউ বলে যাস তো এখানে। স্প্রে-টে আর কিনব না আমরা!"

ততক্ষণে তিন্নিকে নিয়ে মা এসে গেছেন বাইরের ঘরে, পুজোর ঘর থেকে ঠাম্মাও এসে পড়েছেন। হৈ-চৈ শুনে রাধাও দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠাম্মা এসে যাওয়ায় হিগিনকাকু চট করে তাঁকে প্রণাম করলেন, ঠাম্মা আশীর্বাদ করে জিজ্ঞেস করলেন, "নান্দু, দুপইরে খাবি ত এইখানে?"

হিগিনকাকুর আসল ডাকনামটা বাড়িতে এই একটি মানুষই বলেন। কাকু তক্ষুনি বিক্রমপুরী সেজে বললেন, "কন কী মামিমা, থামু না? আমারে খেদাইলেও ত না-খাইয়া যামু না এইখান থিকা!" তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার বাড়িতেও যা-তা কান্ড একটা। মামিমা তিরিশ বছর ধরে কলকাতায় আছেন, কিন্তু তাঁর ভাষা যে-পদ্মাপারের সেই পদ্মাপারের। এদিকে ইংলিশ-মিডিয়াম-ইস্কুলে-পড়া বৌদি আমার ইংলিশ মিডিয়ামের বাংলা চালাচ্ছে, জিভটিভ উল্টে বলছে "আমাড় বাবাড় বাড়ি"। শুনলে গা শিউরে ওঠে। আর তোমাদের ঐ রাঢ়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার "আয়দিঘি" অর্থাৎ রায়-দিঘির কাছে যার বাড়ি, দেইখে শুইনে হিসেব কইরে কথা বললেও সে বলে যায়, ব্যাটারা অ্যান্ড নম্বরের ঠগ, ওজ মাচের রোজনে কম দিচ্চে।" হাতের কাছে ভন্টুর ঠাকুমাকে পেয়ে এবার তাঁরই মুখে মাই-ক্রোফোন ধরলেন হিগিনকাকু, "মামিমা, হেই কথাটা কন দেহি—আমরা কওনের বেলায় তো হোনাই কই, আপনেরা হুনতে হোনেন হোদা।"

ঠাম্মা ছদ্ম রাগে "যা বান্দর পোলা" বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সকলের হাসি থামলে বাবা বললেন, "আর আমার ভাষা?"

"তোমার? তোমার ভাষা এমনিতে চলে যায়। কিন্তু তুমিও প্রচুর ভুলভাল বলো। সেদিন কী একটা কথায় বললে ওব্যাহত। ওটা অব্যাহত হবে। উল্টোদিকে আরেকদিন বললে অভ্যাস, যেটা আসলে হবে ওভ্যাস। তুমি বেক্তি না বলে বলো ব্যাক্তি, প্যাথম না বলে বলো পেথম।"

বাবা স্বীকার করলেন, "বুঝি গন্ডগোল হয়। কিন্তু কোন্‌টা ঠিক কে বলে দেবে?"

হিগিনকাকু হাঁটু চাপড়ে বললেন, "আমি বলব! স্ট্যান্ডার্ড ভাষা আছে না একটা, যাকে বাংলা বইয়ে বলে শিষ্ট চলিত ভাষা? তার নিয়মকানুন আছে, সেগুলো বুঝে নিলেই হল।"

বাবা কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মার কোলে তিন্নি গা—গা—গগা—ঙ—গা ইত্যাদি আওয়াজ আরম্ভ করে দিল। হিগিন-কাকু সব্বাইকে শশ্‌শ্‌ করে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে, তার সামনে মাইক্রোফোন ধরে, টেপ চালিয়ে দিলেন।

তারপর ফিসফিস-গলায় বাবাকে বললেন, "কোনো চিন্তা নেই, আমি ব্যবস্থা করছি—এই তিন্নি আর ভন্টু তোমাদের ভাষাটা দুরস্ত করে দেবে।"

তিন্নি বলল, "আ—গগা।" বোধ হয় বোঝাতে চাইল, "ঠিক বলেছ হিগিনকাকু!"

(ক্রমশ)

মায়ের বন্ধু

প্রসাদ

আজ সন্ধ্যায় মায়ের একজন বন্ধু এসেছিলেন। মিলিকে তিনি অনেক আদর করলেন। প্রথমটায় তার একটু লজ্জা-লজ্জা করছিল। তারপর আবার ভালও লাগল, বিশেষ করে তিনি যখন তাঁর ব্যাগ খুলে নানা রকম লোভনীয় জিনিস বার করে দিতে লাগলেন। কত বড় চকোলেটটা! বাবা কোনো দিন তাকে অত বড় চকোলেট এনে দেন না।

রাত্তিরে খাবার সময়ে তাঁর কথাই হচ্ছিল:

Milly: Auntie's a very old friend of yours, isn't she, Mummy?

Mother: Yes, Milly. We're very old friends. We have known each other for a very long time.

Milly: How long, Mummy?

Mother: Oh, very long. We've been friends since we were children.

Milly: How long ago was that, Mummy?

Chambal: That was long before you were born.

Mother: And quite some time before you were born, too, Chambal.

Milly: If you're such old friends, why don't you ever see each other, Mummy? I see my friends every so often.

Chambal: And quarrel with them every so often.

Milly: I never quarrel with them.

Chambal: How about Chandrika?

Milly: Chandrika isn't my friend. She's horrid.

Chambal: She was your best friend last week, wasn't she? Grown-ups don't change their best friends every week.

Milly: You think you're grown up, do you? You think you're as old as the hills, do you?

Father: Come, come, children. Stop this racket, will you? And, Milly, it's about time you finished eating, isn't it? You remember what Wee Willie Winkie said, don't you? "Are all the children in their beds? It's past eight o'clock." You don't want to annoy him, do you? And now, to return to your mummy's friend. How long was it since you saw her last?

Mother: I hadn't seen her since she got married. She went abroad with her husband almost immediately after.

Father: It was quite a surprise when she rang you up yesterday, wasn't it?

Mother: I could hardly believe my ears. We hadn't met for almost ten years.

Milly: Was it ten years since you saw each other?

দশ বছর বন্ধুতে-বন্ধুতে দেখা নেই! চামেলি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল।

লক্ষ করো:

Mummy hadn't met her friend *for* ten years.

She hadn't met her friend *since* her friend got married.

They had known each other *for* a very long time.

They had known each other *since* they were children.

তা ছাড়া বাক্যের শেষে কীভাবে প্রশ্নটা জুড়ে দেওয়া যায়, তাও লক্ষ করো:

বাঘা

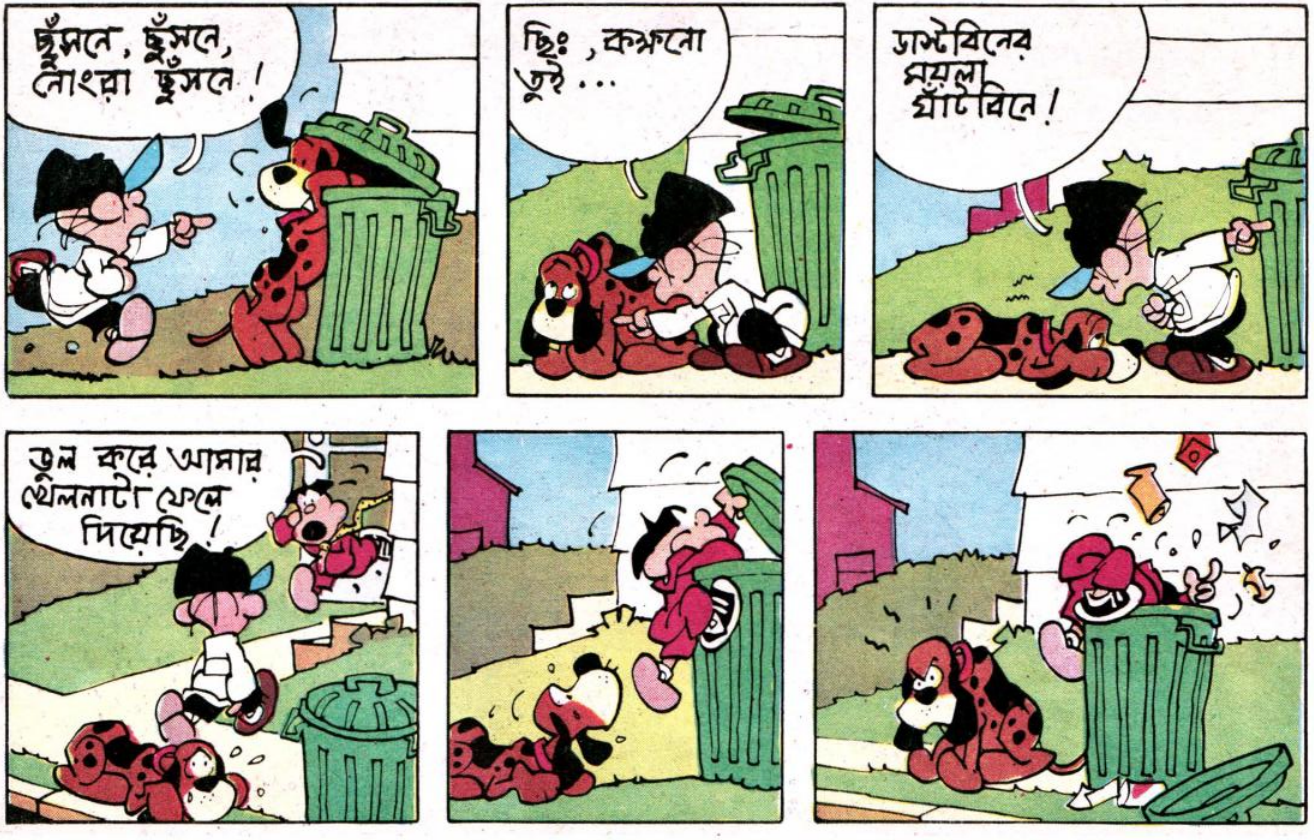

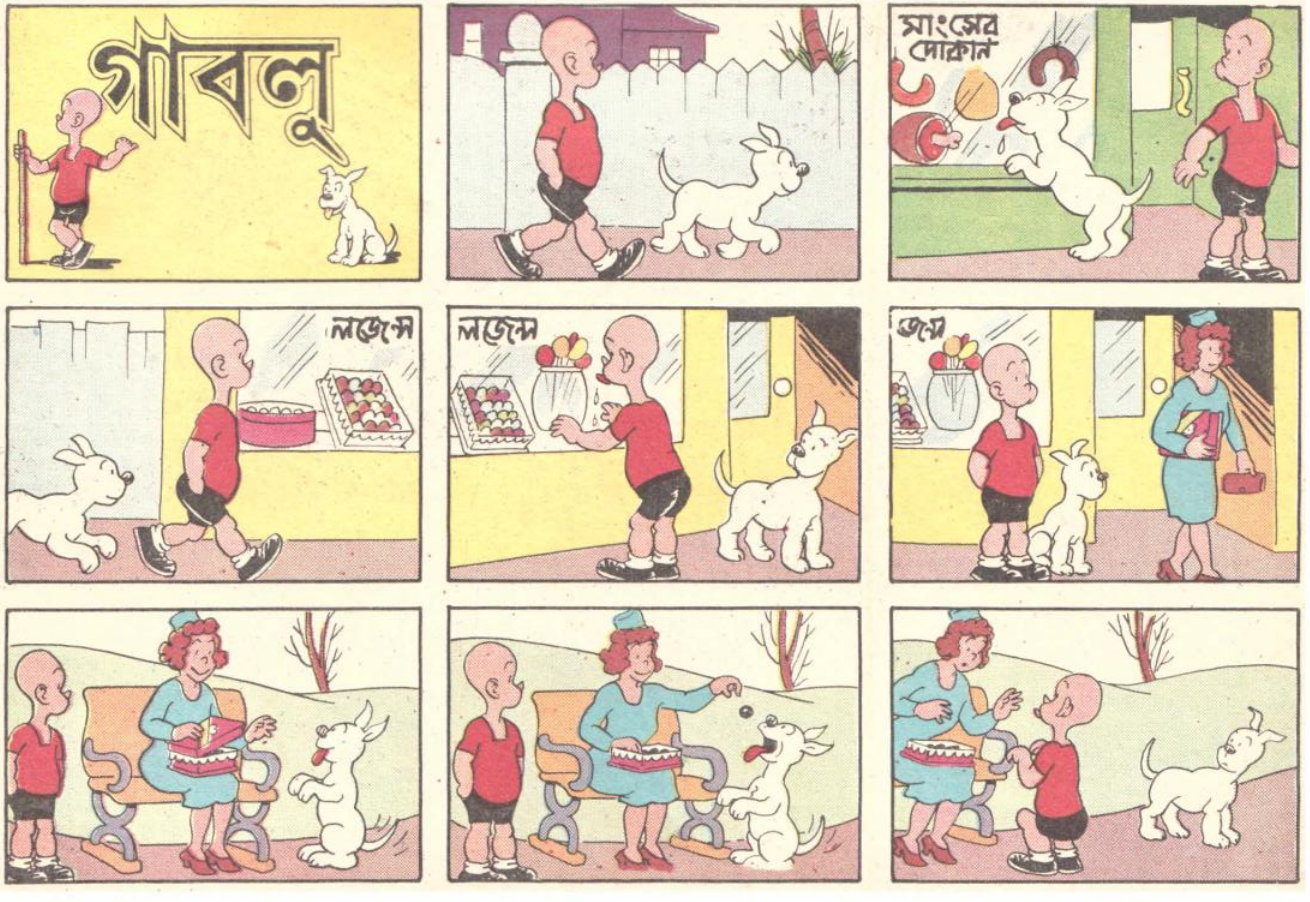

গাবলু
মাংসের দোকান
লজেন্স
লজেন্স
জেন্স

ডিম থেকে পাখি

ঐ একই আকারের মধ্যে পাখি তার জায়গা পালটেছে, পালটেছে তার ভঙ্গি। একটু ভাল ভাবে লক্ষ রাখলেই বুঝবে কেমন আর ক'টা আঁচড়ের মাঝে ডিম থেকে পাখি তার নিজের রূপ ফিরে পেল।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

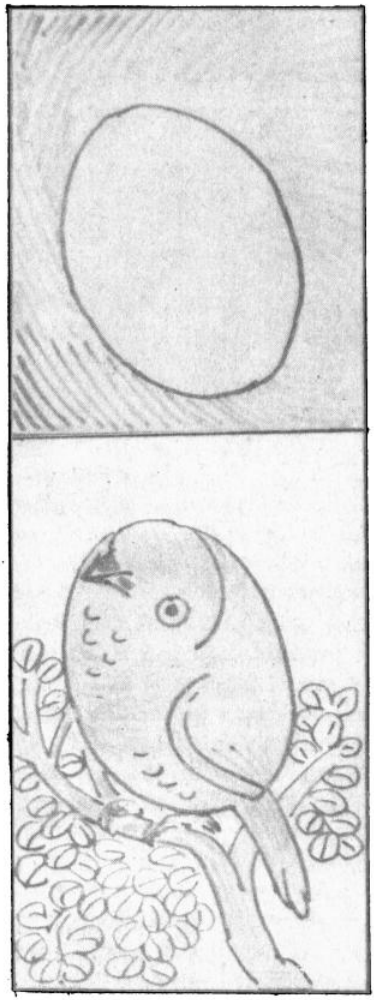

কাগজের ঝোলনা—৪

'ক' নকশায় লক্ষ করে দেখলেই ধরতে পারবে গতবার এক-একটি অংশ যেভাবে মুড়ে জুড়েছ, তাতে সব-সমেত চেহারাটি কেমন হবে। ঠিক এইভাবে ৮—১০টা ফুল তৈরি করে রাখো।

'গ' আর 'খ' নকশায় নজর দিলে দেখবে একটা কাগজকে ভাঁজের ভেতর দিয়ে ছোট আকারে আনা হয়েছে ('গ' ছবি)। সেই এক-হওয়া ভাঁজকে নীচের দিক থেকে টুকরো করে মাও ঝালরের মতো করে ('খ' ছবি)।এবার এই ঝালর কাজে লাগিয়ে যখন ফুল গাঁথা হয়ে ঝোলনা তৈরি শুরু হবে।

জেনে রাখো—(১) একটা গোলের মধ্যে যে চারটে ঠোঙার মতো পাপড়ি পাচ্ছ ('ক' ছবি) তা বেশি টানাটানি করলে ছিঁড়ে যাবে। (২) বাহারি রঙের কাগজ হলে এগুলো ভাঁজ করার সময় রঙের অংশটা ভেতর দিকে থাকবে, বাইরে নয়।

—কারিগর

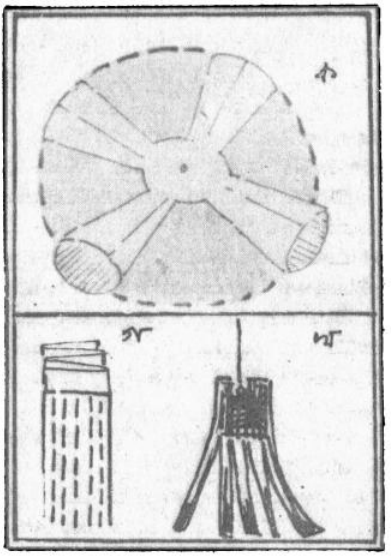

"নিখুঁত পরিষ্কার"

"হুইল যে কি জিনিষ, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা ওকে বোঝালাম—আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে। আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কাচলে কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর ওর দারুণ বিশ্বাস জন্মে গেছে—সাবানের আর দরকারটাই বা কি বলুন তো?"

হুইল

দারুণ ধোলাই শক্তি- চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.12-1810 BG

Reg No WB/CC/264. MH-BY-SOUTH 683